স্মরণ-মনন

॥ দরবেশজীশতবার্ষিকী উপলক্ষে ॥

শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ—
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৭

প্রকাশিকা—
শ্রীমতী দীপ্তি সেনগুপ্ত
আশ্রম
৪৬ জাফরপুর রোড, বারাকপুর

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ
৫এ আউধ ঘরবী, বারাণসী

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত, কবিরাজ
হীরাপুর, ধানবাদ

দরবেশ সাধন বৈঠক
১৭জে নলীন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

এ বি সাহা
২২২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪

মণ্ডল এণ্ড সন্স্
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক—
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সুধীরকুমার সেনগুপ্ত

প্রিয়বালা সেনগুপ্ত

শ্রীচরণকমলেষু

স্মরণ-মনন

লীলা আর তত্ত্ব। তত্ত্বে যিনি পুরুষমহাত্তম্, লীলায় তিনিই নন্দনন্দন—যশোদাহুলাল। সদগুরু কৈশোরানন্দ সরস্বতী আকাশের মত ব্যাপ্ত, সকল তত্ত্বাদির লক্ষ্য। তিনি একম্ এবং সর্বকালের। তিনি ভাবের অতীত এবং ত্রিগুণরহিতম্। অর্থাৎ তাঁর না আছে স্থুরু, না শেষ। তিনি ইনফিনিটি ও তিনি এ্যাবসলিউট।

এই এ্যাবসলিউটকে ভোগ দাও কেন? ঠাকুর, বাবা, গুরুজী ইত্যাদি ডাকতেই বা যাও কেন? নিরর্থক, একদম মেটাফিজিকাল, অবাস্তব পণ্ডশ্রম। কিন্তু এই সদগুরুই যে অসীমকে সীমিত করতে পারেন—পারেন শাশ্বতকে স্থান-কালের বেড়ায় বাঁধতে। তখন তত্ত্বের শেষ লীলার স্থুরু।

অনেকেরই তৈরী পোষাক বা মিষ্টান্নে মন ভরে না, তা সে যতই রুচিপূর্ণ এবং সুস্বাদু হ'ক না কেন। তারা, কোথা থেকে কে কত দরে কখন কিনেছে, কোন মিলের, দোকানের, উপাদান কি—সব জানতে চান। জেনে শুনে আনন্দ পায়, অন্যেরা খেয়ে পরে স্থুখে থাকে। জেনে-শুনে, খেয়ে-পরে আনন্দও পেতে পারেন। স্বভাবতই এটা সময়সাপেক্ষ, জীবনসাপেক্ষও হতে পারে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই সদগুরু, সদগুরু-সাধনতত্ত্ব ত্রি-গুণের খেলা, প্রারব্ধ কর্ম, ক্রিয়মাণ কর্ম, সঞ্চিত কর্ম, কর্মফল ইত্যাদির ধার ধারেন না। স্থূল শরীর, লিঙ্গ শরীর, কারণ শরীর, পঞ্চকোষ ইত্যাদিতে তাঁরা ঘাবড়ে যান। তারা নিত্য নিয়মিত আসনে বসতে চেষ্টা করেন, পেট ভরে খান আর বন ভরে হাগেন। গুরুতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব বুঝলেও শাস্ত্র আওড়ান না, সময় অসময়, তথাহি গুরু

করেন না। হেসে খেলে চলে যান, গুরুও এদের বলেন—"বাচ্চা, খেলা কর।"

জ্ঞানী-গুণীরা এদের (হয়ত) ভাবেন—এলেবেলে। এরা কুলকুণ্ডলিনীর হদিস পায়নি, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না জানে না; মূলাধার, স্বাধিস্থান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র এবং সহস্রারের মর্মও এদের অজ্ঞাত। বৈখরী বাক্য নিয়েই রইল। বিপদে এই এলেবেলের দল যখন 'ঠাকুর আছেন ভয় কি' ভেবে ভারসাম্য বজায় রাখে, কাল আমি মরব বলে রাতে বার্লিভোগ খেয়ে শুয়ে আর ওঠে না, সকালে নাতিকে ডেকে গীতা দিয়ে রাত্রে বিছানায় আসনে বসা অবস্থায় চলে যান, আরেকটা মিরাকেল হল ভেবে জ্ঞানীরা আরও আগ্রহে তত্ত্বের সন্ধানে ঘোরেন। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক জ্ঞানীকেই তত্ত্বজ্ঞান সিকেয় রেখে লীলা অবস্বাদনের দিকে ঝুঁকতে দেখা যায়। আমাদের সদগুরু সাধন সেই লীলারসের সাধন, কেবলই 'সত্যং জ্ঞানম্' নয়, রসো বৈ সঃ। তবে কেহ বা জেনে শুনে, ভেবে চিন্তে সত্যে আসেন, কেহ স্বভাবত।

আমরা যখন সদগুরু শ্রীশ্রীকিরণচাঁদ দরবেশজীর জন্মশতবার্ষিকী পালনের তোড়জোড় করি তখন তত্ত্ব ছেড়ে লীলায় আসি। আমরা 'ঠাকুরের' জন্মশতবার্ষিকী পালনের নামে পুরনো স্মৃতির জাবর কাটতে চাই। পুরনো গানে যেমন ফেলে আসা দিনের ছোঁয়া পাই, পুরনো এ্যালবামে অতীত দিনের স্মৃতি। তা না হলে জন্মবর্ষ, জন্মদিন তো মৃত্যুবর্ষ মৃত্যুদিনের দিকেই এগিয়ে যায়। কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে। বস্তুত গুরুদেহ রাখলে আর সুখ কোথায়? পরের সকল জীবনই তো একটানা মাথুর। 'এই তো মাধবী বনে আমারি লাগিয়া প্রিয়া যোগী যেন সতত ধেয়ায়।'

সেই বেদনায় হয় জ্ঞানের সঞ্চার। জন্মমৃত্যু, বিরহমিলনের বেদনায় শাশ্বত জ্ঞানের উদয়, পড়াবিদ্যা না, পরাজ্ঞান, সদগুরু সাধনে সেই জ্ঞান, মায়ার জ্ঞান, মায়ার মায়ার জ্ঞান ভক্তকে বিবাগী করে না। "বাচ্চা খেলা কর" ভক্ত তখন খেলা করে, শিষ্য লীলা সহচর হয়।

আজ তুমি ভাবাতীত, আমি দিছি ধরা।

মা সরোজবালা

মা সরোজবালা নব্বই বছর আগেকার বাঙালী ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, কুলীন জমিদার ব্রাহ্মণবাড়ীর বউ। তিনি সভাসমিতি করেন নি, ট্রেড ইউনিয়ন করেন নি, ইস্কুল-কলেজেও পড়েন নি। তাঁর না আছে চিঠি, না ডায়েরী। শেষ বয়সে তিনি কিছু শিষ্য-শিষ্যা করেছেন—তারা প্রায় সকলেই শিশু ও বাড়ীর বউ। শিশুদের তখনো গুরুজ্ঞান জন্মায় নি, আর মেয়েরা সাধারণত তত্ত্বজ্ঞানের ধার ধারেন না। মায়ের দিব্য জীবন আলোচনায় প্রচলিত কায়দা চালান বেশ কঠিন ব্যাপার। দরবেশজীর শিষ্য-শিষ্যারা মাকে অপরিসীম ভালবাসতেন—কিন্তু ঠাকুরের দিকে স্বভাবতই বেশী দৃষ্টি দেওয়ায় মাকে তাঁরা সাধন পথে মরুদ্যান ভাবেই দেখেছেন। তব অঞ্চল ছায়ে আমি রহিব ঢাকি। দরবেশজী নিজেই যা হোক মা'র সম্বন্ধে দুচার কথা লিখে গেছেন।

বরিশালে ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশনে পড়তে আসা দরবেশজীর জীবনে একটা পরিবর্তনী ঘটনা। দুরন্ত কিরণচন্দ্রের শিক্ষা ব্যাপারে তাঁর অভিভাবকেরা বিষম সমস্যায় পড়েছিলেন। এতদিন তিনি ভাইপো অমল চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় ছিলেন। অমলবাবুর বি. এ. পাশের পর কিরণকে কোথায় রাখা যায়—সেটাই সমস্যা। অবশেষে বরিশালে অশ্বিনীবাবুর স্কুলে পাঠান স্থির হল। বাংলা ১৩০০ সালে চৈত্র মাসে কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বরিশালে পৌছলেন। এ সম্বন্ধে দরবেশজী লিখেছেন—"এই বরিশালের কথা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। আমার দেহ খণ্ড

খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিলেও আমার দ্বারা বরিশালের ঋণ শোধ হইবার উপায় নাই। প্রচণ্ড ঝড়ের উত্তাল হাওয়ায় ছিন্ন পক্ষ ভগ্নপদ নীড়হারা পাখী সহসা দৈবানুকুলে কোন নিবিড় পল্লব ঘেরা নিরাপদ শাখায় গোপন কোটরে আশ্রয় পাইলে যেমন সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে, বরিশালে যাইতে পাইয়া আমিও সেই প্রকার বাঁচিয়া গেলাম। বরিশালের প্রতি ধূলিকণা আমার নিকট পবিত্র।"

বরিশালে কিরণচন্দ্রের সঙ্গে মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক সমবয়সীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। মাখনের সঙ্গে তার পারিবারিক কুটুম্বিতাও ছিল। মাখনবাবুর সংস্পর্শে এসে দরবেশজী, মা সরোজবালা, গোঁসাইজী, অনেক গোঁসাইশিষ্য এবং সদগুরু সাধনের কথা জানতে পান। তার জীবনে নতুন দিগন্ত খুলে যায়; নতুন মূল্যবোধ জন্মায়।

মা সরোজবালা ঢাকার মেয়ে। ঢাকা বিক্রমপুরের আড়িয়াল গ্রামে তাঁদের বাড়ী। বাবা হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, মা হরমোহিণী দেবী। জন্ম পাবনায়, ১২৮৮ সালের ২৫শে আষাঢ় শুক্লাদ্বাদশী। বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। সরোজবালা মায়ের সঙ্গে আড়িয়ালে থাকতেন। মাখনবাবু ছাড়া তাঁর আরো তিন দাদা ছিলেন। গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার ধার্মিক ও প্রগতিশীল। বাঙলার তখনকার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রথম পুরুষ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনদর্শনে এই পরিবারের ছোটবড় সবাই আগ্রহী ছিলেন। ১৩০১ সালের গরমের ছুটিতে সরোজবালার দাদা মাখনবাবু গোঁসাইজীর সাধন নিয়ে বন্ধু কিরণকে সঙ্গে করে বাড়ী আসেন। সরোজবালার বয়স তখন তের, কিরণ-মাখনের ষোল।

মা চঞ্চলা কিশোরী ছিলেন না। তের বছরে তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, ধর্মপরায়ণা এবং ঘরের কাজে উৎসাহী। গোঁসাইজীর কাছে সাধনের অনুমতিও সে পেয়েছে। গোঁসাইজী • বিয়ে পর্যন্ত

আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেছেন। মা দেখতেও খুব সুন্দরী ছিলেন। গরমের বন্ধে বন্ধুর বাড়ীতে এসে কিরণচন্দ্র স্বভাবতই খুব ইম্প্রেস্ট। দরবেশজী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

"মাখনের গৃহে আরেকটি অপূর্ব জীব দর্শন করিলাম। ইনি মাখনের কনিষ্ঠা ভগিনী সরোজবালা। সরোজের বয়স তখন মাত্র তের বৎসর। আমার ষোল। এই মেয়েটির একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আমার চোখে পড়িল।—সেটি তার উৎকট নীরবতা। সারাদিন চারি পাঁচটির বেশী কথা তাহার মুখ হইতে নির্গত হইত না। মায়ের হুকুমে কাহাকেও ডাকিলে বড় করিয়া ডাকিতে পারিত না, নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে মায়ের অভিপ্রায় জানাইত। মাকে সাংসারিক কাজকর্মে যথাসাধ্য সাহায্য করা ব্যতীত মেয়েটির একটি প্রাত্যহিক নির্দিষ্ট কার্য দেখিতাম—সন্ধ্যার প্রাক্কালে তুলসীতলায় দীপ দিয়া দণ্ডবৎ করা ও সেইস্থানে হরির লোট দেওয়া।

একদিনের জন্যও তাহার এই কার্য্যের ভুলভ্রান্তি ছিল না। তের বছরের মেয়েকে এই প্রকার অসম্ভব রকমের শান্তশিষ্ট দেখিয়া প্রথমটা আমার ভাল লাগিত না। কিন্তু দুই-চারিদিনের মধ্যেই আমি ইহার বিচিত্র ব্যবহারে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম এবং এতটুকু মেয়ের প্রতি অকারণে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল।"

শুধু সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়াই নয়, তের বছরে মেয়ে সরোজবালার মধ্যে গোঁসাইজী এবং সদগুরু সাধন সম্বন্ধে তখনই একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মেছে। যদিও মাখনবাবু, অশ্বিনীকুমার এবং বরিশালের অনেক গোঁসাইজীর শিষ্য-সঙ্গে কিরণচন্দ্রের মনে একটা ঔৎসুক্য জন্মেছে, তিনি মাথার কাছে গোঁসাইজীর ছবিও একখানা টাঙিয়েছেন তবে সাধন নিতেই হবে এমন কোন ধারণা তার মনে

জন্মায়নি। পূজোর ছুটিতে বাড়ী হয়ে আড়িয়ালে এলে সরোজবালা কিরণকে, 'কি আশ্চর্য্য! আপনি কেমন মানুষ। আপনি তাহলে এখনো সাধন পান নাই' বলে বিরক্তি জানিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, কচি মেয়েটির বলাকওয়া নেই এমন ধমকানির কারণ জানতে চাইলে সে বলে বসলো—"সাধন পাওয়া না পাওয়া তো মানুষের হাতে নয় সেটি যার সাধন তিনি বুঝবেন। কিন্তু সাধন প্রার্থী হওয়ার মত সৌভাগ্য আপনার আছে বলে আমার ধারণা ছিল তাই সেদিন বলেছিলাম। এজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এ সাধন না পেয়েও কেবলমাত্র প্রার্থী হয়ে যে মরতে পারবে তারও ভাবনা নেই। এমন করে কেন বৃথা দিন নষ্ট করছেন।" দরবেশজী লিখেছেন—"আমি অনির্বচনীয় বিস্ময়ে দরজার দিকে তাঁহার গন্তব্য পথে চাহিয়া রহিলাম। সাধন না পাইলেও কেবল প্রার্থী হইতে পারিলেই আর ভাবনা থাকে না। এমন ধরণের কথা জীবনে এই প্রথম শুনিলাম। কই মাথন তো এমন ধারা কথা আমাকে কখনো বলেনি। দীক্ষা না পাইয়াও এতটুকু মেয়ের গোস্বামীদেবের প্রতি এই প্রকার অচলানিষ্ঠা এবং অপরিসীম ভক্তি জন্মিল কি করিয়া ভাবিয়া পাইলাম না! ভাবিতে ভাবিতে আমার প্রাণ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। আমার দেহের সমস্ত গ্রন্থী, শিরা উপশিরা মথিত করিয়া কি একটা অখণ্ড অনাদি ক্রন্দনের সুর ঢেউ তুলিয়া বারে বারে হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল।" এর থেকেই দরবেশজীর সাধন প্রার্থনা ও দীক্ষালাভ।

সরোজবালা কিরণকে গোঁসাইজীর নিকট দীক্ষা নিতে পাঠালেন, আর গোঁসাইজী দীক্ষা দিয়ে কিরণকে সরোজবালার কাছে পাঠালেন।

১৭ই আষাঢ় ১৩০২ সাল বৃন্দাবনে দীক্ষা, এক বছর পরে গোঁসাইজী কিরণকে ডেকে বলেন—"২৫শে আষাঢ় বুধবার রাত্রি

ছয়দণ্ড পরে তোমার বিবাহের সময় নির্দিষ্ট রহিয়াছে। তুমি অবিলম্বে খালিয়া যাত্রা কর। আমার আশীর্বাদ রহিল। সরোজবালা তোমার ধর্মপথে প্রধান সহায়ক হইবেন।"

গোঁসাইজীর নির্দেশ মত ২৫শে আষাঢ় ১৩০৩, বুধবার, জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে ছয়দণ্ড রাত্রির পর শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা দেবী সরোজবালার সাথে কিরণচন্দ্রের পরিণয় কার্য সম্পন্ন হইল। ২৯শে আষাঢ় মাকে নিয়ে দরবেশজী আড়িয়াল থেকে খালিয়া যাত্রা করেন। বিয়ে সম্বন্ধে দরবেশজী লিখেছেন—

"খালিয়ায় সরোজবালা আসিলেন, আনন্দ উৎসবে আমাদের গৃহ ভরিয়া উঠিল। এই আনন্দের স্রোত কয়দিন ধরিয়া অবিশ্রামভাবে চলিল। ভোজন, ভজন, গান, কীর্তন, আনন্দ, উৎসব দিয়তাং ভুজ্যতাং। সরোজবালা বলিলেন—এই আনন্দের হাটে আসিয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছি। আমি বলিলাম, এই আনন্দ উৎসব তোমার জীবনে যেন শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, সরোজবালা গলায় কাপড় দিয়া আমায় প্রণাম করিলেন। একদিন বলিলেন—আমার সর্বদা গোঁসাই-এর কথা মনে হইতেছে, আমার সাধন কবে হইবে? শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া দাও। আমি ১০ই শ্রাবণ শুক্রবার সরোজের সাধনের জন্য কলিকাতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট পত্র লিখিলাম। তাহার উত্তরে ১৭ই শ্রাবণ যোগজীবন গোস্বামীর নিকট যে জবাব পাইলাম—তাহাতে তিনি লিখিলেন ছয় মাস আমরা কলিকাতায় আছি। ওঁর শরীর অসুস্থ। এখন কাহারও সাধন হইবে না। ঠিকানা ৪৫নং হ্যারিসন রোড।"

সরোজ-কিরণের সংসার জীবন শুরু হল। সরোজবালা বল্লেন—তোমার সহধর্মিণী আমি। তোমার ধর্মলাভের পথে আমার জীবন উৎসর্গীকৃত হইবে। কিরণ বল্লেন—আমার তপস্যার ফল তোমার ধর্মলাভের সহায়ক হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য এক, ইষ্ট এক। একের তেজ অন্যের করুণা, একের দীপ্তি অন্যের ছায়া, একের শাসন অন্যের স্নেহ—পরস্পরের সম্পূরক। দুয়ে এক হয়ে একপথে একমাত্র অদ্বিতীয়ের দিকে অগ্রসর হব। আমরা শুভ দিনে আমাদের বলে পরস্পরকে পেয়েছি। একসঙ্গে আত্মনিবেদন করলে সত্যি সত্যিই আমরা পরস্পরের হব। পঞ্চশরের বেদনামাধুরীর বাসর রাত্রি—সে আমাদের নয়।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে কত অল্প বয়সে মা এবং দরবেশজী কী অসীম সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। দু' মাস একসাথে এক বিছানায় শুয়েও ইন্দ্রিয় দমন করেছিলেন। গোঁসাইজী সব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি চিঠিতে জানালেন, 'আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা উত্তীর্ণ হইয়াছ। আর ভয় নাই।' পরবর্তী সংসার জীবনে কাম কখনো তাঁদের সব থেকে বড় প্রভাব হয়ে ওঠেনি। দেহ ধর্মকে অস্বীকারও করেননি।

কিছুদিনের মধ্যেই যোগজীবনবাবুর চিঠি এলো—এখন তোমার স্ত্রীকে আনিলে সাধন হইবে, স্বামীর সাথে মা কলকাতায় চল্লেন সাধন নিতে।

গোঁসাইজী তখন ৫৫নং হ্যারিসন রোডের বাসায়। ১০ই মাঘ মা ও দরবেশজী কলকাতায় এলেন। ১২ই মাঘ সকাল সাড়ে ৯টায় মায়ের সাধন হল। সাধন পেয়ে মা প্রেম ভালবাসায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। দু'জনে মিলে গোঁসাই কথা—গোঁসাই প্রসঙ্গ, চোখেও গোঁসাই অঞ্জন লেগেছে। অপরূপের দর্শনে কিরণ-সরোজের ভবন-বন সমান হয়ে গেছে। চির বন্ধনের মধ্যে তাঁরা চির মুক্তির স্বাদ পেলেন।

সংসার তবু কিরণকে আনমনা করে, জড়ায়ে আছে বাঁধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে, সংসার বড় না সন্ন্যাস?

গণ্ডির মধ্যে আর তিনি আবদ্ধ থাকতে চাইছেন না। অল্পে আর সুখ নাই। বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।

বিয়ের একবছরের মধ্যেই এই ভাব। সরোজবালাকে বল্লেন সব। মা বল্লেন, 'তুমি তো সন্ন্যাসীই আছ' তোমার তো এই ধারা। যুগে যুগে রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে তোমার উত্তরণ সকাল সন্ধ্যায় যা পেয়েছ, তুমি দান করে রিক্ত হয়েছ এগিয়ে চলাই তোমার ধর্ম। আর সীমার মধ্যে তোমার তো চিত্তস্ফূর্তি হয় না। গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা। আমার কথা থাক্। আমি যে তোমার সহধর্ম্মিনী, সমমর্মিনী। গোঁসাই-এর আশীর্বাদে আমি বেদনা নদী পার হয়ে অমৃতের সন্ধান পাব। 'আমার সকল কাঁটা ধন্য হয়ে ফুটবে গো ফুল ফুটবে। আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।'

১৩০৩—১৩০৬। এই তিনবছর দরবেশজী মায়ের সঙ্গে ছিলেন। সুযোগ পেলেই গোঁসাই সঙ্গ করতে ছুটেছেন। কখনো কলকাতায় কখনো পুরীতে। গোঁসাইজী পাঠিয়ে দিতেন সংসারে। ১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রাত ৯টা বিশ মিনিটে গোঁসাইজী পুরীতে দেহ রাখলেন। দরবেশজী তখন সেখানে। বেদনায় পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। "সেই স্নেহস্পর্শ, সেই মধুর উপদেশ, সেই মধুর ভর্ৎসনা—আজ যেন তাহা আরও মধুর বোধ হইতে লাগিল কাছে থাকিয়া যে মধুরত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলাম—আজ তাঁহাকে হারাইয়া সেই মাধুরিমার স্মৃতি বেদনার রসে আরও মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠিল।" নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

মা এখন জলপাইগুড়িতে, গোঁসাইজীর বিরহে মা ও মাখনবাবু ম্রিয়মান। ঠাকুরও এসে পৌঁছালেন। যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে, সে কাঁদনে তারাও যে কাঁদছে। সরোজ-কিরণের মিলনের মধ্যে

ছিলেন গোঁসাইজী। আজ গোঁসাইজীর বিরহে তাঁদের সম্মিলন। তিনি এবার দুঃখের বেশে এসেছেন, বেদনা চিরদিনই মহত্তরি মনোভাব। তোমাকে এখন আমরা নতুন করে পাব। বিরহানলে আমাদের তুমি নিখাদ করবে। তাপিত, পিপাসিত জীবনে অমৃতবাণীর বার্তা পাঠাবে। ছিন্ন হবে যে বন্ধন বন্দির। তুমি এস। এস মানস-বিভাষ আসনে, এস বাসনা বিলাস নাশনে, এস ত্যাগের তীব্র দলনে। এত জ্ঞানের কথা, কিন্তু মন ভরে কই। তোমার অদর্শনে আমরা যে অস্থির।

এস সুন্দরমম নয়নানন্দ নন্দন-ফুলহার
প্রাণ রহে কি না রহে, তোমার বিরহে
দেখে যাও একবার।

আমি গোঁসাই প্রেমে বিবাগী হব। গোঁসাই গোঁসাই রব রসনায় কব। গোঁসাইজীর দেহত্যাগের পর ভোলা কিরণচাঁদ আরও উদাসীন হয়ে গেলেন। শুধু ঘুরে বেড়ান। ভ্রমন ভজন আর কীর্তন। দিন যামিনী আমার মন মানে না। সরোজবালা কুলবধূ, সীমার মাঝে তাঁর অসীমের আস্বাদন। তাঁর, 'বিলাসের সীমা-সিদুর-শঙ্খ সাজে, বাসনার সীমা সবারে তৃপ্তি দিয়া / তোমার সকলি সীমার মাঝে, অসীম কেবল প্রেম মণ্ডিত হিয়া।'

বড় বাড়ী, অনেক লোকজন, স্নান করে কাপড় মেলে দেয় সবাই। সময় মত না তুললে কার কাপড় কার ঘরে যাবে ঠিক নেই। অমল মাঝে মধ্যে কিরণের কাপড় ভুল করে পরে বসে। কিরণ সরোজকে বলে বলে হয়রান। ঠিক সময় কাপড় তুললে—শুকিয়ে গেলেই তুলে ফেল্‌লে তো এ বিভ্রাট হয় না। নতুন বউ হট হট করে স্বামীর জিনিসপত্র নিয়ে ছুটো-ছুটি করলে আর পাঁচজনেই বা কি বলে। তাছাড়া আমার অন্য কাজ নাই বুঝি। সেদিনও অমল কিরণের ধুতি পরে বসল। রেগে কিরণ সরোজকে এক কিল বসিয়ে দিল। দুঃখ দুঃখ, লজ্জা লজ্জা, ঘুমের মধ্যেও কিরণের শান্তি নেই। কিরণ বল্লে, সরোজ, স্বপ্নে দেখলাম ঠাকুর আমায় লক্ষ্মীছাড়া হব বলে বর দিলেন।

মা বল্লেন, তুমি তো লক্ষ্মী ছাড়াই রয়েছ। মাকে সংসারে রেখে কিরণচাঁদ ভারত ভ্রমণে বের হলেন। ১৩০৮ সালে আবার খালিয়ায় ফিরলেন। এই বিবাগী কি করে জমিদারি চালাবে। সংসারে অশান্তি। গোঁসাইজী শাসন করে স্বপ্নাদেশ

দিয়েছিলেন আরও বার বৎসর সংসার করতে হবে। ফাঁকি দিলে চলবে না। সংসারে থেকে ধর্ম করা বড় কঠিন। সেই কঠিন সাধনা সুরু হল। 'সরোজ এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। আমার ধর্ম রক্ষায় সে সর্বদা সচেষ্ট। আমার সাধনের নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি কখনো সহ্য করেন নাই। এমনকি আমার জীবন সংকটেও তিনি আমাকে নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিতে দেন নাই। তাহার এই ধর্ম রক্ষার উৎসাহ, সাহায্য, আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও ধর্ম সাধনাই আমাকে সকল বিপদ আপদ ও অসুস্থতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ধরিত্রীর মত সহনশীলা নীরব নারীমূর্তি আমাকে সর্বদা সাহায্য না করিলে আমি যে কোথায় কি অবস্থায় পড়িতাম বলিতে পারি না।'

অ-দিদি করে কথা কন। কার কথা আর। এমন করলে যে দুদিনে পথে বসতে হবে। এই যে এতো দান ধ্যান, উৎসব কীর্তন, হিল্লিদিল্লী করা বাপের জমিদারি বলেই তো। নিজের মুরোদে টাকা আন্‌ত তবেই বুঝতাম। ওহে, তোমাদের কিরণচাঁদ যে চাটুজ্যেদের জমিদারিটি লাটে ওঠাবে। কিরণচাঁদ পৈত্রিক জমিদারি ছেড়ে টাকা ধার করে ব্যবসায় নামলেন। স্বোপার্জিত ধনে জীবন নির্বাহ করবেন। 'যা আছে আমার আছে, যাব না তোদের কাছে। এক বিন্দু স্নেহ নাহি চাই। এককোঁটা আঁখিজল কিম্বা আঁখি ছল ছল, কাজ নাই তাও কাজ নাই।'

বরিশালে নতুন সংসারজীবন সুরু হল। দরবেশজী ফটোর কাজ, লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেনসি, কাপড়ের এজেন্‌সি ইত্যাদি নিলেন। চ্যাটার্জি কোম্পানি—ফটোগ্রাফার্স। প্রচুর আয় হতে লাগলো। ১৩১০ থেকে ১৩১৮ বৈশাখ পর্যন্ত তিনি বরিশালে ছিলেন। বার বৎসর সংসার শেষ হলে গোঁসাইজীর সাক্ষাৎ নির্দেশে তিনি ১৩১৯ সালে মাঘী সপ্তমীতে প্রয়াগে সন্ন্যাস নেন।

ওগো সুন্দর, তোমার আসন পাতিব পথের ধারে। মিলনে বিরহে চিরদিন জানাজানি।

টাকা পয়সা, ঘরবাড়ী, স্ত্রীপুত্র সংসার নহে, আসক্তিই সংসার। দরবেশজীর বরিশালের সংসার, সং-সার ছিল না। মা'র সেবায় সে সংসার তপোবনের মতই ছিল স্নিগ্ধ। সরোজবালার দাক্ষিণ্যে সংসারে স্বর্গ নেমে এসেছিল। মা যে সংসারে স্বর্গবাস এবং স্বর্গে সংসার করেন। এক চিঠিতে দরবেশজী লিখেছেন—

"আমার সহধর্মিণী বিবাহের পূর্বেই সাধনের অনুমতি পাইয়াছিলেন। বিবাহের কিছুকাল পরেই তাঁহার সাধন হইয়া যায়। তিনি সাধন পাইবার পরই উক্ত ফটোমূর্তির (দরবেশজী দীক্ষাপূর্ব জীবনে যে ছবি মাথার কাছে রেখেছিলেন) সেবা অতিশয় নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে আরম্ভ করেন। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম আনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে একত্রে স্থাপন করা হয় এবং রীতিমত ভোগ রাগ ও সেবাপূজা চলিতে থাকে। আমার সহধর্মিণীর এই কার্যে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল বটে, কিন্তু তখন আমি মনে করিতাম এইরূপ সেবাপূজা নিম্নাধিকারীর জন্য।

ইহার পর একবার শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর তিরোভাবের দুই-চারি বৎসর পরে আমি একবার খুউব ঘটা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি ঝুলন পূর্ণিমা উপলক্ষে মহোৎসব করিয়াছিলাম। প্রায় ৩০।৪০ জন গুরুভ্রাতা বিদেশ হইতে আসিয়া এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। এই উৎসবে পূর্ণিমার দিন মধ্যাহ্ন ভোগ দেখার পরে, ভোগমন্দির খুলিয়া দেখা গেল কোন কোন ভোগের জিনিসের অংশ বিশেষ নাই, এইস্থানে আঙুলের দাগ রহিয়াছে এবং যে আসন বসিবার জন্য দেয়া হইয়াছিল, কেহ বসিয়া উঠিয়া গেলে নরম আসনে যেমন একটা বসিবার ছাপ পড়ে, এই আসনে ঐ প্রকার ছাপ

রহিয়াছে। এই ব্যাপার সমস্ত গুরুভাই-ভগ্নীগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ বলিতে লজ্জাবোধ হইতেছে, আমি ঐ ঘটনাকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল কেহ যদি দুষ্টামি করিয়া খাদ্য জিনিসে ঐ প্রকার অঙ্গুলীর ছাপ বসাইয়া দেয়, বসিবার আসনে নিজে বসিয়া ঐ রূপে উপবেশনের চিহ্ন করিয়া রাখে—তবে তাহা অসম্ভব কি? এই ব্যাপারে আমার পত্নী এবং আমার একটি ভাইঝি (তিনিও আমাদের গুরুভগ্নী ছিলেন) দুইজনের উপরে একটা তীব্র বিরক্তি ও প্রাণে দারুণ জ্বালা উপস্থিত হইল। এই ঘটনা লইয়া আমার সমস্ত গুরুভাই-ভগ্নীরা আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি মনে প্রাণে কী ভীষণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম—তাহা মনে হইলে এখনো আমার ভয় হয়।

চব্বিশ ঘণ্টা কাটিল, পরদিন মধ্যাহ্নে পাছে আজও কেহ ভোগ নষ্ট করে, এই ভয়ে নিজে গিয়া ভোগ নিবেদন করিলাম। নিবেদন করিবার সময় হাউ হাউ করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। পরে বাহিরে আসিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দুয়ারের কাছে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে কানে ডাক পৌঁছিল 'কিরণ' আমি চমকিয়া উঠিলাম, এ ঠিক সেই গলা, দেহে থাকিতে প্রয়োজন মত তিনি যেমন ডাকিতেন, শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল। কি করিব বুঝিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছি, আবার দ্বিতীয়বার ডাক শুনিলাম 'কিরণ' তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলিয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

দেখি তিনি আসনে বসিয়া আছেন। খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে; কোন কোন বাটীতে খাদ্য নাই এবং থালায় মাখিবার দাগ রহিয়াছে। আমি ঘরে ঢুকিতেই পার্শ্বস্থ ডাবরের কাছে এঁটো

হাত লইয়া গিয়া, এমন ইঙ্গিত করিলেন, যেন আমাকে শ্রীহস্তে আচমনের জল দিতে বলিলেন। আমি জলপাত্র লইলাম— এ পর্যন্ত জানি। ইহার পর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাই।

যখন জ্ঞান হইল, দেখি ঠাকুরঘরের এককোণে আমাকে সরাইয়া লইয়া চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হইতেছে। আমার সহধর্মিণী এবং কয়েকটি গুরুভাই এবং গুরুভগ্নী আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। আমি ঝা করিয়া উঠিয়াই ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া দেখি তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। এমন কি পাত্রে খাদ্য জিনিসের যে অভাব দেখিয়াছিলাম উহাও ভুয়া, পাত্রগুলি যথারীতি পরিপূর্ণ। তখন বড় দুঃখিত ও ব্যাকুল হইয়া সকলকে বলিলাম 'তোমরা কিছু দেখনি'? আমার পত্নী, আমার ভাইঝি, বানরিপাড়ার গুরুভ্রাতা ৺ললিত মোহন গুহ ঠাকুরতা এবং মাদারিপুরের গুরুভ্রাতা যজ্ঞেশ্বর সেন এই চারিজন আমাকে ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আমার একরূপ সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঢুকিয়াছিলেন। ইঁহারা বলিলেন হ্যাঁ। তাহারা ঠাকুরকে আসনে উপবিষ্ট দেখিয়াছেন। আর সকলে একটু পরে ঢুকিয়াছিলেন। কিছুই দেখেন নি। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে এই আমার প্রথম দর্শন।

এই ঘটনার পর আমি খুব ভালভাবেই বুঝিলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোমূর্তির সেবা পূজা নিম্নস্তরের ত নহেই বরং ধ্যান ধারণা অপেক্ষা বহুগুণ উচ্চাঙ্গের। তথাপি আমি নিজেকে অনধিকারী মনে করিয়া সাক্ষাৎভাবে ঠাকুর সেবায় যোগ দিই নাই। মনে প্রাণে শ্রীমতি দেবীর ঠাকুরসেবা সমর্থন করিয়াছিলাম মাত্র।"

প্রথমজীবনে এবং পরে কাশীবাসী হয়ে মা ঠাকুরের সেবা পূজা ভোগরাগ নিয়েই থাকতেন, কোন তত্ত্বের ধার না ধেরে। স্বাভাবিক-ভাবে, 'জৈছেতৈছে শ্রীশ্রীঠাকুর সেবার যে কোন বর্ধিত আয়োজনই তাহার পক্ষে আনন্দের কারণ।

এই সেবাভাব কঠোর তপস্বী যোগীরাজ কিরণচাঁদ দরবেশজীর ভিতরেও বর্তায়। 'এই অপূর্ব সেবা আমার চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। পূর্বে যাহা একান্তভাবে আমার বিশিষ্টা গুরুভগ্নীরই অধিকার, কর্তব্য ও চিন্তার বিষয় বলিয়া মনে করিতাম, এখন তাহা নিবিড়ভাবে আমারই ভজন হইয়া গিয়াছে।'

এ তো অনেক পরের কথা। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে দরবেশজী পাকাপাকি ভাবে ঘর ছাড়লেন। একত্রিশ বৎসরের সরোজবালা কী নিয়ে থাকেন? তাঁর সাংসারিক আশ্রয় কোথায়? তিনি ধনী ঘরের বউ, বাপের বাড়ীও সচ্ছল। তবু তাঁর জন্য আমাদের কষ্ট হয়। জানি দরবেশজী গোঁসাইয়ের আদেশে সব কিছুর বন্দোবস্ত করে ভদ্রলোকের মত সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে গোঁসাইজীর মত তিনিও গৃহ-জীবনের স্ত্রীকে মঠে স্থান দিয়েছিলেন, তবু মার স্বামীহীন গৃহবাস, দরবেশজীর বন্ধনহীন সন্ন্যাসজীবনের চেয়ে অনেক কঠিন ব্রত।

জপ নয়, তপ নয়, ধ্যান নয়, ধারনা নয়, পূজাপাঠ কিছুই নয়। শুধু নাম আর প্রণাম—এই নিয়েই মা সরোজবালা বালিকা থেকে বধূ, বধূ থেকে মা ও সদগুরুতে উত্তীর্ণা হয়েছেন। ভগবানের যা শ্রেষ্ঠধন 'নাম'—তাই তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের দিয়ে গেছেন।

নিজের যা কিছু অপরে বিলায়ে
আপনা হারায়ে ফেলেছ
তাইতো তোমারে স্বরূপে না হেরি
বেশ লুকোচুরি শিখেছ।
নিজের স্বচ্ছ স্নিগ্ধ শ্যামল
বর্ণটি দিলে আকাশে

তব পদনখ জ্যোতিটুকু পেয়ে
শারদশশী প্রকাশে।
অরুণেরে দিলে অধর রঙ্গ
কুসুমেরে দিলে হাসি তরঙ্গ
নয়ন ভঙ্গি দিলে কুরঙ্গে
মৃগমদে সার ছেড়েছ।
ময়ূরপুচ্ছ চূড়াটি বাঁধিয়া
মেঘের মাথায় পরালে
নিজবনমালা বৈজয়ন্তি
রজনীর গলে ধরালে।
মনপ্রাণ দিলে গোপিকা কুঞ্জে
তব বর পেয়ে মধুপ গুঞ্জে
পঞ্চমে সাধা বাঁশরীর তান
কোকিল কণ্ঠে ঢেলেছ।

তোমার ধরা খানি ছিল
তড়িতে তা নিলে
কোথা লয়ে যায় ছুটিয়া।
মনোহর দেখে কেড়ে নিতে চায়
ঘনদল পথে জুটিয়া।

কল্পতরু হে, সবে সব দিলে
বিশ্ব মাঝারে সবে সব পেলে।
নামটি শুধু দাওহে কাঙালে
অবশেষে যাহা রেখেছ।

দরবেশ

ছেলে মার কাছে শুয়ে গল্প শুনছে। মহাভারতের গল্প, কৌরব-সভায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর কাপড় ধরে টানছে। অসহায় অবস্থায় দ্রৌপদী একে একে উপস্থিত সকলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন, কারুর মুখে রা নেই। ভীষ্ম বললেন, মা ধর্মের গতি বুঝতে পারলাম না। দ্রৌপদী তখন দরিদ্রবন্ধু অগতির গতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ডাকলেন—দীননাথ, দীনবন্ধু! ছেলেটি চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলেন দীননাথ, দীনবন্ধু কোথায় তুমি, লজ্জা নিবারণ, কাঙ্গাল সখা। দ্রৌপদীর প্রতি সমবেদনাপূর্ণ উত্তেজিত এই চিৎকারে মা স্বভাবতই গল্প বন্ধ করে দিলেন। ছেলেটি মাকে পরের ঘটনা জানবার জন্য 'তারপর, তারপর' বলে ক্রমাগত তাড়া দিতে সুরু করল।

বিরক্ত হয়ে মা বল্লেন, অমন চিৎকার করলে আর কিছুই বলব না। না বললে ত বয়েই গেল, আমি জানি এর পর কি হল। কি জানিস বল তো। কেন এর পর শ্রীকৃষ্ণ এলেন। এসে হারামজাদা দুঃশাসনকে মাটিতে ফেলে মুখটা বালিতে রগড়ে দিলেন। মা হেসে বললেন, দূর একি হয়। 'তবে সে শালা দীনবন্ধুই নয়'—বলে ক্রোধে উত্তেজনায় ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। বাড়ীতে হুলুস্থুল। জলের ঝাপ্‌টা দাও, হাওয়া দাও। বাবা এলেন, মহাভারত থেকে পড়ে শোনালেন—সত্যি সত্যি শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর সাহায্যে এসে কাপড়ের পর কাপড় জুগিয়ে তাঁর লজ্জা রক্ষা করলেন। তখন ছেলের কী নাচ। এই না হলে শ্রীকৃষ্ণ।

ছেলেটি ফরিদপুরের (তখন বরিশাল) খালিয়া গ্রামের কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট ছেলে কিরণ। অসম্ভব দুরন্ত, একরোখা ও তেজী। সেবার মা রসময়ী কর্তার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলেন, বুড়ো তৈলঙ্গস্বামীর কোলে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল তিন বছরের খোকা, কি আশ্চর্য স্বামীজিও কোলে তুলে নিলেন, দুজনার সে কি হাসি। মা তো সন্ন্যাসীর অঙ্গে পা লেগে গেল দেখে ভয়ে নীল। মার অবস্থা দেখে তৈলঙ্গস্বামী ছেলের কপালে বিভূতি মেখে মার কাছে ফিরিয়ে দিলেন, তৈলঙ্গস্বামীর ব্যবহারে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কত লোক থাকত সচল বিশ্বনাথ স্বামীজিকে ঘিরে, সবাই বললে এ ছেলে সাধু হবে।

আর ষষ্ঠীর দিন রাত্রে স্বপ্নে .তোকে তো আমি জটাজুটধারী গৈরিক পরা, মালা গলায় এক মহাপুরুষের কাছে দিয়েছিলাম। তিনি তখনকার মত আমার কাছে তোকে রেখে গেলেন। তুই একটু পড়াশুনা কর্। এত পাগলামো করিস্নে। অমল তোর ভাইপো, কেমন ভাল লেখাপড়ায়, তুই কি কাকা হয়ে মুর্খ হয়ে থাক্‌বি।

পরের দিন কিরণচন্দ্র চার পাঁচখানা কাপড় পরে বাড়ীর পাঠশালায় উপস্থিত। পণ্ডিত, সরকার মশাই শ্রীমানের অদ্ভুত অবস্থা দেখে বেত ধরলেন—এস এগিয়ে এস। নাগালের মধ্যে পেয়েই কাপড় ধরে টান্। পর পর কাপড় খুলতে লাগলো। পড়ুয়ারা তখন মজা পেয়ে গেছে। হাসির দমকে সরকার মশাইয়ের উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল, শেষে উঠে মারতে গেলেন। যেই এক ঘা দিয়েছেন কিরণ সটান বাড়ী চলে গেল। অন্যায় মার সে বরদাস্ত করে না। দাদার কাছে নালিশ হল, পরদিন দুপুরে পণ্ডিত স্নান সেরে কাপড় শুকোতে ছাদে উঠেছেন। রেলিং ছাড়া ছাদ। পেছন থেকে কিরণ এসে সরকারকে ফেলে দেয় আর কি। সরকার

কথা দিলেন সেইদিনই তিনি দেশে চলে যাবেন, গুরুগিরি ছাড়বেন এবং এ ব্যাপারে মুখ খুলবেন না। তবেই ছাড়া পেলেন। কিরণ মাইনর স্কুলে ভর্তি হল।

কিরণ মেধাবী ছেলে। বার বৎসর বয়সে প্রথম কবিতা লেখেন—কাতরে মিনতি করি, শীতল চরণ ধরি, দুঃখ হর করুণা নিধান/ পুরাও মনের আশা, দাও ভক্তি দাও ভাষা, গাহিবারে তব স্তুতি গান। একবৎসর আগে কলকাতায় তাঁর বাবা মারা যান। উপনয়নে তাই দেরী হল—তের বছরে পৈতে। কিরণ কবিতা লেখে, চুরি করে খেজুরের রস খায়, নৌকোয় বাচ খেলে। বৎসরে একবার থোঁড়া নিমচাঁদ মাঝির নৌকোয় করে মার সঙ্গে মামা বাড়ী যাওয়া একটা উৎসবতুল্য ব্যাপার। মামাত বোন ক্ষীরোদার উপর দাদাগিরি করার সুযোগ আমগ্রামেই মেলে। বাড়ীতে সে জন্মাবধি কাকা হলেও দাদা ডাকার মত তার কেউ ছিল না।

সময়টা তখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিরণচন্দ্রের জন্মের ঠিক এক বৎসর পূর্বে কুচবিহার বিবাহ নিয়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ১২৮৫ সাল, জ্যৈষ্ঠমাসে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে কলকাতা টাউন হলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হল। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তারপর পূর্ববাংলায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে—ঢাকায় আসেন। পূর্ববাংলা ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্যরূপে তিনি বিভিন্নস্থানে ধর্ম প্রচার করেন। ১২৯০ সালে আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে সদগুরু লাভের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে ঢাকায় ফেরেন। তাঁহার তখনকার ধর্মপ্রচারে পূর্ববাংলার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সুরু হয়। অসাম্প্রদায়িক এই ধর্মে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকল পথের পথিকদেরই পথনির্দেশ আছে। ঢাকা শহরের কাছে এক জঙ্গলে তিনি গেণ্ডারিয়া আশ্রম স্থাপন করলেন ১২৯৫ সালে। গেণ্ডারিয়াকে কেন্দ্র করে সারা-বাংলাদেশে

গোঁসাইজী সনাতন ধর্মের পুনপ্রতিষ্ঠার সূচনা করেন, বাংলায় তখন একটি নাম শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—গোঁসাইজী।

কিরণ ঢাকায় এসে জগন্নাথ কলেজিয়েট জুবিলি স্কুলে ভর্তি হলেন, বয়স তের ছাড়িয়েছে। ক্লাস-টিচার ব্যায়ামবীর পরেশনাথ ঘোষ। তিনি কিরণকে কুস্তিগীর আসরী খাঁর আখড়ায় ভর্তি করে দেন। কিরণের শরীর চিরদিনই সুস্থ, সতেজ, নিয়মিত ব্যায়ামে সে আরও মজবুত হয়ে উঠলো। এই সময় পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজে সাধু মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'চৈতন্য ও ব্রাহ্মধর্ম' নামক বক্তৃতা কিরণকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট করে। চণ্ডিচরণ কুশারী তখন পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। প্রতি রবিবার কিরণ এখন উপাসনায় যোগ দেয়।

ঢাকায় শহুরে হয়ে উঠলেও দুষ্টুমি কমেনি। কুমারটুলীর ছাত্রাবাসে তাঁর কাছে এক ঘটক এল একদিন। কুলীনের ছেলে—অনেকদিন থেকেই ঘটকেরা আসা যাওয়া সুরু করেছে। ঘটকমশাই হাতের লেখার নমুনা চাইলে কিরণ একখানা কাগজের একদিকে প্রকাণ্ড একটা 'ক' এবং অন্যদিকে বিরাট এক 'A' লিখে দিলেন। অন্যান্য আবাসিকেরা তো হেসেই অস্থির। কিরণ চঞ্চল ছিল, ভীরু ছিলনা। একদিন তার সামনেই এক দুর্বৃত্ত একজন পথচারীকে ছোরা মারে। কিরণ দৌড়ে খুনীকে ধরে ফেলে, কিন্তু বয়স কম হওয়ার ধরে রাখতে পারল না। যুবক পালিয়ে যায়। পুলিশ কিরণকে সাথে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আসামীর খোজে ঘুরে বেড়াতে সুরু করে। অন্যদিকে গুণ্ডারাও কিরণকে চোখে চোখে রাখছে—একা পেলেই খতম। পরেশবাবু এবং আসরী খাঁ সাহেবের পরামর্শে কিরণ ঢাকা ছাড়ল।

নারায়নগঞ্জ থেকে স্টীমারে বাড়ী যাওয়া। স্টীমার নয়ত যেন ছোটখাট জাহাজ। মেঘনার কাল জল। অকুল সুপুরি

বন জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে। গ্রামগুলিকে আম্রকুঞ্জ মনে হয়। মেঘ ছোয়া শিরিষ গাছে মহাকাশ যাত্রার বাসনা। মেঘনার বুকে পাল তোলা পশ্চিমি নাও, জেলেদের ডিঙ্গা। ডেকে দাড়িয়ে কিশোর কবি গ্রামবাংলার রূপ দেখছে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' হঠাৎ মেয়েলী গলার বুকফাটা চিৎকারে কিরণের সম্বিত ফিরে এলো। রেলিং-এর ধারে বসা বৌটির বাচ্চাটা নদীর জলে পড়ে গিয়েছে। কিরণ মেঘনার জলে ঝাপিয়ে পড়ল।

পেয়েছে—ছেলেটাকে পেয়েছে। এক হাত উঁচু করে তুলে ধরল শিশুটিকে। অন্য হাতে কাপড় খুলে ফেলল—জুতোও। জাহাজ তখন অনেকদূরে। পনের বিশ মিনিট সে এক অসাধ্য সাধনের ইতিহাস, ভেসে থাকার প্রাণপন চেষ্টা। একবার ডোবা, একবার ওঠা। বাড়ীর দীঘিতে অবিশ্রাম সাঁতার কাটা, নদীতে নৌকা বাওয়া, সব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কিরণ মেঘনার ঢেউ-এর সাথে এক হাতে লড়ছে। স্টীমার ঘুরল, বোট নামল—টেনে তুলল অসীম সাহসী কিশোরকে, হাতে তার দু'বছরের শিশু। দুজনেই অর্ধচেতন। কিছুক্ষণ পরেই শিশুটি সুস্থ হল। ছেলেমানুষ মা'টি পাগলের মত ছুটে এসে কিরণকে 'বাবা আমার বাবা' বলে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

ধন্য কিরণচাঁদ। সাধু, সাধু! তোমার গর্বে আমাদের বুক উঁচু হয়ে উঠেছে। যে দেশে তোমার মত ছেলে জন্মায় সে দেশের আর ভাবনা কি?

এবার কলকাতায়। ভাইপো, অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ. পড়ে। অমলবাবু কিরণের লোকাল গার্জেন। কিন্তু কিরণ মানলে

তো অভিবাবক। আর্য মিশন স্কুলের হেডমাষ্টার রামদয়ালবাবু এক ফাপরে পড়লেন। রিপোর্টে মাষ্টার মশাইরা লেখেন কিরণ ভাল ছেলে, মেধাবী ছেলে, আর তার বাড়ীর গার্জেন কিনা লেখে not good, intolerable, simply unbearable. ব্যাপার কি? কিরণকে ডেকে পাঠালেন হেড স্যার। দেখুন স্যার যদিও অমল আমার গার্জেন কিন্তু সম্পর্কে ও আমার ভাইপো। আমার জুনিয়র, বয়সে যদিও বড়। তা আমি কি করে ভাইপোর কথায় চলি। তাই ও ওই সব লেখে রিপোর্টে। কথাটি রামদয়ালবাবুর কাছে reasonable বোধ হল।

আর্য মিশনে কিরণের গীতা কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। শ্রীশ্রীশশীভূষণ বসুর 'বীরত্ব' বিষয়ক, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্মসমাজের এবং রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "The morality of language' নামের বক্তৃতা কিরণের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ই সে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম শুনতে পায়। ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রশাখায় বক্তৃতা করার অনুরোধ নিয়ে কিরণ ও ললিতমোহন দাস স্থকিয়া ষ্ট্রীটে উপস্থিত হল। কিরণ নীচে অপেক্ষা করে আছে, ললিতমোহন উপর থেকে ফিরে এসে বল্লো গোঁসাই বক্তৃতা দেবেন না। তিনি বক্তৃতা দেওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। গোঁসাইজীর মালা তিলক ও হিন্দুয়ানী ললিতের ভাল লাগেনি। ফেরার পথে সে গোঁসাইকে ছেড়ে কথা কইল না।

কিরণ তখন সেই মারাত্মক সুন্দর বয়ঃসন্ধিক্ষণে। একদিকে কলকাতার বিলাসী জীবন তাকে প্রলুব্ধ করে, অন্যদিকে ভাল হবার বাসনা। তার ধারনা সে প্রেমে পড়েছে। 'বৃষ্টিতে ভিজবেন না অসুখ করবে' বলে একদিন এক এগার বছরের মেয়ে তার হাতে এক ছাতা ধরিয়ে দেয়—সেই থেকেই এই

বিভ্রাট। দাদা দুই ধমকে সেই কাফ-লাভ ভেঙে দিলেন। মনের দুঃখে কিরণ 'পাগলের-প্রলাপ' নামে এক কাব্যই লিখে বসল। সমস্ত স্ত্রী জাতীর উপর প্রবল অনীহা তাকে পেয়ে বসল। আত্মশুদ্ধির জন্য কিরণ দেয়ালে লিখল—A wife is a bosom serpent, a domestic evil,/A night invasion and a midday devil. জীবন গঠন করার জন্য সে এক টেন কমাণ্ডমেণ্টস লিখে তা পালন করতে সচেষ্ট হল, তার ডায়রী থেকে—

কিরণের প্রতি করুণ পুরুষের দশ আজ্ঞা

প্রথম : উদরের অন্ততঃ চারি আনা অংশ অপূর্ণ রাখিয়া আহার শেষ করিবে।

দ্বিতীয় : একাদশীর দিন সমস্ত দিবারাত্র এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যার রাত্রে ভোজন করিবে না।

তৃতীয় : প্রাতে ওঠা বসা ও হস্তচালনা ব্যায়াম করিবে এবং অপরাহ্নে দ্রুতপদে তিন মাইল হাঁটিবে।

চতুর্থ : শয়নের কেবল পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার কয়েকটি শ্লোক ও বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিবে।

পঞ্চম : রাত্রি এগারটা বাজা মাত্র শয়ণ এবং ভোর পাঁচটা বাজা মাত্র গাত্রোত্থান করিবে।

ষষ্ঠ : কঠিন শয্যায় শয়ন ও কঠিন উপাধান ব্যবহার করিবে।

সপ্তম : রাত্রে শয়নের পূর্বে এবং প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়া মাত্র এক গ্লাস করিয়া জল পান করিবে।

অষ্টম : মাসের মধ্যে অন্ততঃ একবার জোলাপ গ্রহণ করিবে।

নবম : 'পবিত্রতা' এই শব্দটি সর্বদা মনে জপ করিবে।

দশম : এই শরীর ব্রহ্ম মন্দির। তিনি সর্বদা এই মন্দিরে বাস করেন—দিবারাত্রি এই কল্পনা করিবে।

কিরণের বৈশিষ্ট এই যে ঐ নিয়মগুলি তাঁর অভ্যেস হয়ে গেল। শুধু লিখেই ক্ষান্ত হলেন না।

এদিকে গোঁসাইজীর আচার ব্যবহার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছে। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র দেবরঞ্জনের অন্নপ্রাশনে গোঁসাই উপস্থিত ছিলেন। এক তান্ত্রিক সাধু খাওয়ার আগে কারণ (মদ) চাইল। গোঁসাই অতিথিকে মদ আনিয়ে দিতে বল্লেন, এ ব্যাপারে কলকাতা তোলপাড়। ব্রাহ্মসমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার উদ্বোধনেই গোঁসাইকে কটাক্ষ করে তীব্র মন্তব্য করলেন। সমবেত ব্রাহ্মগণও গুঞ্জন করে উঠলো। চলবে না চলবে না, ব্রাহ্মগণ এক হও। আজ যে রক্ষক ভক্ষকরূপে দেখা দিল। ব্রাহ্মসমাজের আজ অতীব দুর্দিন। কিরণও সমালোচনায় যোগ দিল। ১৩০০ সালের মাঘোৎসবে কিরণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দেখে। মহর্ষির সচিব পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মশাইর সাথেও পরিচয় হয়। সভায় শিবনাথ শাস্ত্রী অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানালে সমবেত ব্রাহ্মগণ প্রচুর অর্থ, বস্ত্র, গহনা দান করেন। এক-ভদ্রমহিলা আবেগে কানের মাকড়ী টেনে ছিঁড়ে ফেলে শাস্ত্রীমশাইর দিকে ছুড়ে দিলেন। কান থেকে তখন ধারায় রক্ত পড়ছে। নগর কীর্তনও ছিল। বিপিন পাল গান ধরলেন—

নামে অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়
বোবায় কথা কয়, বধিরে শোনে হে।

১৩০০ সালের মহোৎসব কিরণকে অভিভূত করে ফেলেছিল। ছুটিতে দেশে ঘুরে এলো কিরণ। জমিদারের ছেলে, বাজে সঙ্গী এমনিতেই জোটে। কিন্তু কিরণ কখনো কুসঙ্গে মজা পায়নি। ভাইপো অমলবাবু বি. এ. পাশ করলেন। কিরণদের কলকাতা বাস শেষ হল।

এবার বরিশালে। ১৩০০ সালের চৈত্রমাস। ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউসনের—দ্বিতীয় শ্রেণীতে (ক্লাস নাইন) ভর্তি হলেন। হেড মাস্টার কালীপ্রসন্ন ঘোষ। 'স্যার' ঋষিতুল্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কর্মযোগী দরিদ্রবন্ধু পণ্ডিত কালীশচন্দ্র ভট্টাচার্য শিক্ষক। অমলবাবু, অশ্বিনীবাবুকে চিঠি দিয়েছেন তাঁর কাকামশাইর সম্বন্ধে। জাতমাষ্টার অশ্বিনী দত্ত এক নজরেই কিরণকে বুঝতে—পারলেন। একথা, সেকথার পর জিজ্ঞেস করলে—'দুষ্টামি কর বোলে কিরণের 'আর করব না' শুনে তিনি হেসে ফেল্লেন। তখন অশ্বিনীবাবুর বেড়ানোর সময়। কিরণকেও সঙ্গে নিলেন। স্নেহে তিনি কিরণের হৃদয় জয় করেছেন ততক্ষণ, তার—সঙ্গে বেড়ানও এডুকেটিভ। সেইদিন কিরণ জানতে পারে অশ্বিনীবাবু গোঁসাইজীর মন্ত্রশিষ্য। বরিশাল। বরিশাল।

"অতি দূর সমুদ্রের পর—
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দ্যাখে দারুচিনি
দ্বীপের ভিতর।
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে;
বলেছে সে 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?"

গোবিন্দ দাশগুপ্ত, শিবচন্দ্র গুহঠাকুরতা, নন্দকুমার ঘোষ, সত্য ভূষণ, নলিনী দাস, অক্ষয়কুমার গুহঠাকুরতা, সূর্যকুমার ও রাইচরণ চক্রবর্তী, পার্বতীচরণ ঘোষ, নিবারণ, প্রেমানন্দ আর মাখন—সবাই আমরা তোমার জন্যই বসে আছি। কোথায় ছিলে এতদিন। আমাদের দলে, গোঁসাইদলে যোগ দাও। গোঁসাই কথা বল—গোঁসাই কথা শোন। দরিদ্রবন্ধু দলে যোগ দাও। সেবার ক্ষেত্র তৈরী কর।

"অবশেষে একদিন বড়ই ইচ্ছা হইল গোঁসাইয়ের একখানি

ছবি আনিয়া কাছে রাখি'। কলকাতার বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স্-এর গোঁসাই শিষ্য নীলমাধব দের কাছ থেকে গোঁসাইজীর বড় ছবি এনে কিরণচাঁদ শিয়রে টাঙিয়ে রাখল। ১৩০১, ৫ই ভাদ্র। কিরণ ব্রাহ্মসমাজে যায়, বাল্যাশ্রমেরও সে উৎসাহি সভ্য। বি. এম. এর ছাত্রদের সাথে ছুর্ভিক্ষের চাঁদা সংগ্রহ করেন। কলকাতার 'তৃপ্তি' ও কাশীপুর—হিতৈষীতে তার কবিতাও ছাপা হল। এদিকে মাখনবাবু গোঁসাইজীর কাছে সাধন নিয়েও এসেছেন। (১৩০১, বৈশাখ)। কিরণের মনে দীক্ষা নেওয়ার কোন বাসনা জাগেনি। আর গোঁসাই শিষ্যগণ কাউকে দীক্ষা দেবার জন্য অনুরোধ করে না। "মন্ত্রই যে নিতে হবে তার কি মানে আছে। মন্ত্র না নিলে কি আর—সাধুভক্তি হয়না। এতদিন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া অবশেষে একটা মন্ত্র লইব ও বুড়োদের মত মালাজপিব ?"—কিরণের তখন এই মনোভাব।

অবশেষে বন্ধু মাখনের ছোট বোন, তেরো বছরের মেয়ে সরোজ-বালার কথায় কিরণের চমক লাগল। 'আপনি তা হলে এখনো সাধন পান নাই।' 'কি আশ্চর্য, আপনি কেমন মানুষ ?'—সরোজ-বালার এই উক্তি; কিরণের জীবনে 'বেলা যায়'। বাচ্চা মেয়ের এই কথা কটি কিরণের মধ্যে একটা যেন রিয়াকসান সুরু করিয়ে দিল। —না জানি কেন রে—এতদিন পর জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

সে রাতে কিরণ এক স্বপ্ন দেখল। জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বপ্ন—

"একটি নদী তরতর বেগে নিঃশব্দে বহিয়া যাইতেছে। নদীর এপারে বালুকাময় মরুভূমি; আমি একাকী সেখানে দাঁড়াইয়া আছি। নদীর ওপারে সবুজ ঘাসগুলি মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া যেন নাচিতেছে। সেখানে একটি বন, কিন্তু সে বনটি অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহাতে আর কোন আগাছা বা জঙ্গল নাই।

বনের পশ্চাতে বৃক্ষলতা ঘেরা সুন্দর একটি শ্বেতবর্ণের অট্টালিকা ধূ ধূ করে দেখা যাইতেছে। নদীর পুলিনে একটি মনোরম বৃক্ষ; চারিদিকের ডালপালাগুলি ভূমি স্পর্শ করায় অভ্যন্তর ভাগটি ঠিক একটি কুঞ্জের মত দেখা যাইতেছে। এই স্থানে দুইটি মূর্তি পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু দূর হইতে অস্পষ্টতাবশতঃ কি মূর্তি বা কোন জাতীয় বৃক্ষ তাহা কিছুই চিনিতে পারিলাম না। মূর্তি দুইটির অঙ্গ হইতে একপ্রকার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া সমস্ত বৃক্ষ ও সম্মুখস্থ নদীটি আলোকিত করিয়াছে। দেখামাত্র আমি আকৃষ্ট হইলাম। মূর্তিদ্বয়ের সম্মুখস্থ হইয়া উহা কাহার মূর্তি দর্শন করিবার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা জাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি কোথাও জনপ্রাণী নাই—আমি একা, নিকটেও এমন কিছু নাই যাহা অবলম্বন করিয়া আমি এই খরস্রোতা স্রোতস্বতী পার হইতে পারি। আমার ব্যাকুলতাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরিশেষে সাঁতার দিয়াই নদী পার হইব মনে করিলাম। পরিধেয় বস্ত্রখানি ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইলাম এবং 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্' বলিয়া যেই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িব অমনি কে যেন আমার স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া বাধা দিয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে অথচ মধুর স্নেহপূর্ণ সুরে বলিলেন, 'থামো, নিজে সাঁতরে কখনও নদী পার হওয়া যায়?' আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া যেমন এই অনাহূত আগন্তুক ব্যক্তিটির দিকে তাকাইব অমনি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কাহাকেও আর দেখিলাম না।"

স্বপ্নটি কিরণের মনে ঝড় বইয়ে দিল। কে আমি, কি আমি ওগো কেন আমি বিশ্বের মাঝারে? আমি যে একা, বড় একা। আমি ক্লান্ত-প্রাণ এক।

"সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না, পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখছি আমি, অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায়

প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা ;

জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ !

কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল।

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে ; যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি কাল রাতে অতিদূর আকাশের সীমানায় কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—

মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?

জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?"

গোঁসাইর সাধন কি চাইলেই পাওয়া যায় ? কত লোক তো বারে বারে ফিরে এসেছে। তুমি কেন আমায় অমন করে বল্‌লে। 'সাধন পাওয়া না পাওয়া মানুষের হাতে নয়—সেটি যার সাধন তিনি বুঝবেন। সাধন প্রার্থী হবার মত সৌভাগ্য আপনার আছে বলে আমার ধারণা ছিল। এই সাধন না পেয়েও কেবলমাত্র প্রার্থী হয়ে যে মরতে পারবে তাঁরও ভাবনা নেই। কেন এমন বৃথা সময় নষ্ট করছেন ?' আমি অনির্বচনীয় বিস্ময়ে দরজার দিকে সরোজের গন্তব্যপথে চাহিয়া রহিলাম। সাধনের কথা থাক, শুধু প্রার্থী হতে পারলেও হবে। এমন কথা তো জীবনে এই প্রথম শুনলাম। মাখনও তো এমন কথা বলেনি কখনও। আমার দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা মথিত করিয়া একটা অখণ্ড অনাদি ক্রন্দনের সুর ঢেউ তুলিয়া বারে বারে হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল। মনে হইল চারিদিক

হইতে ভীষণ আকৃতি কাহারা বিকট মুখব্যাদন করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আমাকে এই মুহূর্তেই কোন উপায় স্থির করিতে হইবে। আর সময় নাই।" মাখন—মাখন, সবগুনে মাখন বললো—'আর কত কাল এই ভাবে সময় নষ্ট করবে? শীঘ্র গিয়ে গোঁসাইয়ের চরণে আশ্রয় নাও, তিনিই পেছন থেকে তোমাকে ডেকেছেন। ভাই আয়ু তো কমে ছাড়া বাড়ে না।' কিরণ কেঁদে ফেললো। পর দিনই সাধন প্রার্থী হয়ে চিঠি দিল। সে চিঠির উত্তর প্াওয়া গেল না—একটি অস্বাভাবিক ঘটনা—গোঁসাইজী সব সময়ই চিঠির জবাব দেন। নিজে না পারলে অন্য কেউ লিখে দেয়। অস্থিরতা বেড়ে গেল।

আড়িয়াল থেকে বরিশালে ফিরে এল দুই বন্ধু। সাধন প্রার্থী হয়েই কিরণ এক নতুন জীবনের সম্ভাবনা অনুভব করল। এই তো সুখের সুরু। এই সময় শিশির কুমার ঘোষের 'অমিয়-নিমাই চরিত' পড়ে কিরণের বিশেষ উপকার হয়। যদিও আমিয়-নিমাই চরিতে মহাপ্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সঠিক দেখানো হয় নাই, তবু এই পড়ে কিরণ মহাপ্রভুকে আপন ভাবতে পারল—একান্ত আপনজন বলে বোধ হল তার। একটি ষোল বছরের বালকের কাছে তত্ত্বজ্ঞান কেহই আশা করে না। কাশ্যপ গোত্রের চট্টোপাধ্যায়রা কেহই মহাপ্রভুর পার্ষদ বা ভক্ত ছিল না দেখে কিরণের সে কি আক্ষেপ। কিরণের এখন গোঁসাই ধ্যান, গোঁসাই জ্ঞান। গোঁসাইজীর উপর অনেক গান সেই সময় রচনা করেন। গান গুলিই পরে "বিজলী সঙ্গীত" নামে প্রকাশ পায়।

কিরণের মত আরেকজন সাধন প্রার্থী ছিলেন বরিশালে। শিক্ষক চন্দ্রনাথ দাস। দুজনে মিলে গোঁসাই বিষয়ক গান গাইতেন। একদিন দুজনে সকাল আটটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে গান গাইলেন। 'যখন আমাদের বাহ্যজ্ঞান জন্মিল, তখন চাহিয়া

দেখি অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। ঐ চারিটি গানেই সমস্ত দিন কোথা হইতে অতিবাহিত হইয়া গেল টেরও পাইলাম না। ত্রস্তে বস্তে দরজা খুলিয়া দেখি বাইরে এক অপূর্ব দৃশ্য। দুয়ারের পাশেই ৺কালিশ চন্দ্র ভট্টাচার্য পণ্ডিত মহাশয় চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন, তাহার চক্ষু বাহিয়া দরদর করিয়া ধারা বহিতেছে। ওদিকে বসন্ত কুমার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মদীয় বন্ধু সুধন্য কুমার দাস বারান্দার সিঁড়ির উপর পা ছড়াইয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর মাখন দুয়ারে দাঁড়াইয়া মৃদুমৃদু হাসিতেছে, আরও দশ বারোটি ছেলে উঠানে নিস্তব্ধ নির্বাক। ইহারা বহুক্ষণ হইতে আসিয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া যে যাহার ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন—কাহারও ফিরিয়া যাইবার মন হয় নাই।" গোঁসাইজী শিষ্য গাভার সাধু সতেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সহিত কিরণের এই সময় পরিচয় হয়। সত্যেন্দ্রনাথ কিরণকে ভালবাসিয়া ফেলেন। কালীবাড়ীর পূজারী সোনা ঠাকুরকেও বালক কিরণচন্দ্রের মনে ধরে যায়। কিরণ কালীবাড়ী আর শ্মশানে গভীর রাত পর্যন্ত বসিয়া থাকতেন।

শীঘ্রই গোঁসাইজী বৃন্দাবন যাবেন। কিরণ আবার ব্যাকুল হয়ে উঠল। বহুদূর বৃন্দাবন। এর আগেই সাধন চাই। ব্যস্ত হয়ে চিঠি দিলেন মহাত্মা যোগজীবন গোস্বামী মশাইর কাছে। উত্তর এল—'পশ্চিম হইতে আসিলে পর আপনার সাধন হইবে।'

"আমাকে খোঁজ না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও
তোমাকে
খুঁজি নাকো,—এক নক্ষত্রের নীচে তবু—একই আলো
পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি।"

আর তো পারা যায় না। সুদূর বৃন্দাবন চলে যাবেন গোঁসাইজী।

একবার চোখেও দেখা হল না। কিরণ কলকাতা যাবে। সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে গোঁসাইজীর অস্থায়ী আশ্রম। গোঁসাই শিষ্য সোনাকান্ত পাথেয়র জন্য গুরু দর্শনে যেতে পারছেন না। তাকেও নিয়ে যাও কিরণ—মাখন অনুরোধ করলো। তাই সই। কিরণচন্দ্র, সোনাকান্ত কলকাতা রওনা হল।

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে গোঁসাই দর্শন হল। কি শান্তসৌম্য মূর্তি, দেখলে চোখ ফেরান যায় না।

'ভাবিলাম ইনি কি আমার মত লোককে দীক্ষা দেবেন? গোঁসাইজীকে দর্শন করিয়া ভাইপোর বাসায় উঠিলাম। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আবার গোঁসাইজীর ওখানে আসিলাম।' প্রতিদিন এই রুটিন, বসে থেকে দর্শন। একবার শুধু ভাইপোর কাছে যাওয়া। দেখে দেখে আশা মেটে না। ওরা এমনভাবেই দেখে। মহাপ্রভু এমনভাবেই জগন্নাথ দর্শন করতেন। এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে, পাষাণও গলে যায়। কে এমনভাবে দর্শন করে গোঁসাইজীকে? যুগযুগান্তের পিপাসা মেটাতে চায় কে-ও? আপনি কি সাধন প্রার্থী? জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। 'ছিলাম—কিন্তু এখনও আছি বলতে পারছি না—এমন সৌম্যমূর্তি মহাপুরুষ—ইনি কি আর আমাকে দীক্ষা দিবেন?' যদি বলেন তো আমি আপনার হয়ে জিজ্ঞাসা করি। রাজি হয়ে গেল কিরণ। "ব্রহ্মচারীজী গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—গোঁসাই জানতে চাইলেন 'পূর্বে কোন চিঠি দিয়েছিলেন কি?' এবার কিরণ নিজেই উত্তর দিলেন—'হাঁ, চিঠি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে উত্তরে জানাইয়াছিলেন যে, বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া দীক্ষা দিবেন।' গোঁসাই বললেন,—'তবে তো জবাব দেওয়া হইয়াছে।' এই কিরণের জীবনে প্রথম গোঁসাই সঙ্গ। ১৩০১ সালের ষোল থেকে বিশে পৌষ। কি আনন্দ! কি আনন্দ!

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর।

গৌর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল / চল সজনী, যাইগো নদীয়ায়। একবার যে তাঁকে দেখেছে সে কি আর ভুলে থাকতে পারে? "যখন মানুষের প্রাণ প্রকৃতরূপে সেই ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হয়, তখন সে তাঁর জন্য অধীর হইয়া পড়ে। সে জিজ্ঞাসে নদী! বল, চন্দ্র! সূর্য বল; তরুলতা! বল, আমার ঈশ্বর কোথায়? বল তিনি কোথায় গিয়েছেন? কোন পথে গেলে তাঁকে পাবো? তোমাদের পায়ে ধরি আমাকে বলে দাও। তোমরা কি তাঁকে দেখেছ? এইরূপে ঈশ্বর বিরহে তিনি উম্মাদ হইয়া পড়েন। মনুষ্যে তিরস্কার করিবে, তিনি কি তাহা আর গণ্য করেন? লজ্জা, ভয় কি আর তাঁহার প্রাণে স্থান পায়? ছুটিয়া যার-তার কাছে যান। মুখে কেবল এই একই কথা—তোরা বল্ আমার সে কোথায়? তাঁহাকে না পাইলে আমার প্রাণ বাঁচে না।" কলকাতা থেকে ফিরে কিরণের এই অবস্থা। বরিশালে ভাল্ লাগছে না, খালিয়ায় ভাল লাগছে না। আহারে রুচি নাই। চোখে নিদ্রা নাই। ছুটে কলকাতায় এলেন আবার। কলকাতায় অশান্তি আরও বেড়ে গেল। গোঁসাইজী তত দিনে [১৩০১, ৯ই ফাল্গুন] বৃন্দাবন চলে গিয়েছেন।

ঠাকুর, তোমা বিনে দিন তো আমার চলে না। 'কলিকাতায় আসিয়া গোঁসাইজীর কথা কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্রমে তাঁহার চিন্তা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তাঁহাকে না পাইলে আর আমার চলে না। তাঁহাকেই যদি না পাইলাম তবে আর বাঁচিয়া লাভ কি?' ১২ই আষাঢ়। দুর্যোগপূর্ণ বর্ষার রাত্রি।

কিরণচন্দ্র জগন্নাথ ঘাটে এসে উপস্থিত হল। গোঁসাইকে না পেলে প্রাণ বিসর্জন করবে। গঙ্গাজলে তোমাকে দেহ সমর্পণ করব। গতি রহুঁ তুয়া পদসঙ্গ। বর্ষার গঙ্গা, তীর প্লাবনী। হে গোঁসাই করুণা-সিন্ধু, দীনবন্ধু, তুমি কোথায়? ঝাঁপ দিলেন জলে। 'অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্যোতির্ময় গোঁসাইজী ওপারে প্রকাশিত হইলেন। ডাক আসিল। এস।' কিরণ মূর্তি লক্ষ্য করিয়া গঙ্গার ওপারে উপস্থিত হলেন। সিক্ত বসনে রেল লাইন ধরে বৃন্দাবন পথে ছুটলেন।

জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথ গামী ভবতু মে।

মধু বৃন্দাবনে লীলা অভিরাম, পড়ে মনে মোর পড়ে যে কেবলই মনে। মনে নয়, চোখেও। এখন তেমনি বহে সে যমুনা। গোঁসাইজী দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন এসেছেন। প্রথম বারে [১২৯৬-৯৭] প্রায় দু' বৎসর বৃন্দাবনে বাস করেন। ১২৯৭ সাল, "গত ১০ই ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী চির প্রার্থনীয় সিদ্ধ দেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোক ইহাকে মৃত্যু বলে কিন্তু একবার বিশ্বাস-নয়নে চাহিয়া দেখ, যোগমায়া আজি সখীবৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব শোভা সৌন্দর্য লাভ করিয়াছেন।" এবারে তিনি তীর্থমণির কুঞ্জে আশ্রম করেছেন। পথে শিষ্যদের বলেছেন 'তোমরা বৃন্দাবনে গিয়ে বৈষ্ণবচিহ্ন মালাতিলক ধারণ করিও। অনিবেদিত বস্তু ভোজন করিও না। যাহা খাইবে তুলসী দিয়া নিবেদন করিয়া খাইবে। ব্রজবাসী নরনারীদিগকে ভগবানের গণ মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিও। কখনো তাঁহাদিগকে নিন্দা করিও না। তাঁহাদিগকে নিন্দা করিলে ব্রজে তিষ্ঠিতে পারিবে না। এবার গোঁসাই-র সাথে আছেন জগবন্ধু মৈত্র মশাই, সর্বশ্রী বিধু ঘোষ, কুঞ্জ গুহঠাকুরতা, সরলনাথ, সপুত্র শ্রীমতি শান্তিসুধা দেবী, ঠাকুমা মুক্তকেশী দেবী এবং

মহাত্মা যোগজীবন গোস্বামী। গুরুগত প্রাণ শ্রীশ্রীধর ঘোষ মহাশয়তো অবশ্যই আছেন।

"শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। সেখানে সকলই অদ্ভুত। শ্রীবৃন্দাবন-ভূমির বৃক্ষলতা, পশু, পক্ষী সমস্তই অন্য প্রকারের। অন্য কোন স্থানের সহিতই ইহার তুলনা হয় না। সেখানকার বৃক্ষের শাখাপত্র সকল নিম্নমুখী। অনেক স্থানে বড় বড় বৃক্ষ সকল লতার মত রজসংলগ্ন হইয়া আছে।

ব্রজের পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায় এখনও সেই ভাব বর্তমান। বেলা শেষ হলে ব্রজময়ীরা উৎকণ্ঠিত প্রাণে পথের দিকে চেয়ে থাকেন। কতক্ষণে রাখাল বালকেরা গরু নিয়ে ফিরবে তাই দেখেন। চেনা-অচেনা জ্ঞান নেই। ঘরের ভাল ভাল জিনিস নিয়ে কত আদর করে রাখাল বালকদের খাওয়ান। রাখালদের আসতে একটু বিলম্ব হলে স্নেহ ভরে তাদের কত গালাগালি করেন।" শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা / বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ।

কিরণচাঁদ রেললাইন ধরে এগিয়ে চলেছেন। সম্মুখে গোঁসাইজীর শ্রীমূর্তি। কখনো হাটেন কখনো বসে পড়ছেন। দু' নয়নে অশ্রু ঝরে। বালি পর্যন্ত পৌঁছতে বারোটা বাজল। গায়ের কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেছে। সারা গায়ে কাদা, চক্ষু রক্তবর্ণ। শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন। এক ভদ্রলোক তাঁকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। সযত্নে কিরণকে খেতে দিলেন। বিশ্রাম করতে বললেন তিনি। যদিও কিরণচাঁদ তাকে প্রথমে চিনতে পারেননি—তিনি আসলে কিরণদের কুটুম্ব। বাড়ীতে ফেরৎ পাঠাতে তার কি চেষ্টা। অতি কষ্টে তাকে নিরস্ত করে কিরণ আবার পথে নামলেন। ভদ্রলোক এবার রেলের টিকিট দিতে চাইলে কিরণ কেন জানি বিন্ধ্যাচলের টিকিট নিতে রাজী হলেন।

বিন্ধ্যাচলে কিরণের জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। এক ব্যক্তি

বললেন আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনাকে যোগমায়া-দেবীর মন্দিরে পৌঁছে দিতে আমার উপর আদেশ হয়েছে। যোগমায়া মন্দিরে তাঁর মা যোগমায়ার দর্শন লাভ হয়। মা বললেন ভয় নেই। অন্তরে বাহিরে আমি তোমার শান্তিরূপী জননী। তোমাকে পথ দেখিয়ে চলেছি ভয় কি?

সেখান থেকে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। পূজারী বললে এইমাত্র জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী আপনার কথা বলে গেলেন। আপনি এখানে প্রসাদ পান। যোগমায়া দেবীর দর্শনে কিরণের পথশ্রম ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয়ে গিয়েছিল। এখন তাঁর সামনে এক হিরণ্ময় মন্দির দেখা দিল। মন্দিরে গোঁসাইজী এবং মাতা যোগমায়া হর-পার্বতীরূপে বসে। তারা কিরণকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। কিরণ আনন্দে আত্মহারা। সংকীর্ণ পার্বত্য পথ ধরে ছুটে চললেন। পথে এক শাকাহারী সাধুর সঙ্গে দেখা হল। দুজনে শুধু শাক আহার করলেন। বার বৎসর নুন বিহীন শাক সিদ্ধ আহার ঐ সাধুর গুরুর বিধান। সাধুটি কিরণকে ষ্টেশনে যাওয়ার একটি সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন। দু'দিন বিন্ধ্যাচলে থেকে আবার বৃন্দাবনের পথে চলা সুরু হল।

ষ্টেশনে এক ভদ্রলোক কিরণকে প্রয়াগ নিয়ে যান। গাড়ীতে এই ভদ্রলোক রাঙ্গিয়া বাবা নামে এক সাধুর কথা বলায়, কিরণ সোজা রাঙ্গিয়া বাবার আশ্রমে ওঠে। রাঙ্গিয়া বাবা যেন কিরণচাঁদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। পৌঁছতেই এক পাত্র দেখিয়ে বললেন, 'ওতে ঘোল আছে পীও।' ঘোল পান শেষ হওয়া মাত্র তিনি কিরণকে ষ্টেশনে যেতে বললেন। আর বললেন 'গোঁসাইজীকে আমার প্রণাম দিও।' ষ্টেশন, গাড়ীও দাঁড়িয়ে, আবার সেই টিকিট সমস্যা। ফাঁকি দিয়ে তিনি যাবেন না, এক রেল কর্মচারী জোর করে তাঁকে চলন্ত ট্রেনে তুলে দিল। টিকিট নেই সুতরাং কিরণ পরের ষ্টেশনে

নেমে যেতে চাইলো। ভদ্রলোক কিরণের সততায় মুগ্ধ হয়ে বললেন, বাবা আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, তবু তুমি আমার গুরুর কাজ করলে। আমার যেন চোখ খুলে দিলে। প্রার্থনা করি আমার মত আরও হাজার লোক তোমার কাছে সৎ পথের নির্দেশ পায়। আমি তোমাকে মথুরায় নামিয়ে দেব। সেখান থেকে তুমি বৃন্দাবন যেও।"

প্রভুর মহিমা দেখি মোরা চমৎকার
প্রয়াগে তোমার লীলা বর্ণে সাধ্য কার।

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেম স্বরূপে সহজাভিরূপে
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে।

—চৈতন্যচন্দ্রোদয়

মথুরায় নেমে পাণ্ডাদের ভয়ে কিরণ একেবারে চুপ হয়ে গেল। এক পাণ্ডা বললে, আমি গোঁসাইজীর পাণ্ডা লুচিপুরী, আমাকে বিশ্বাস করতে পার। তোমার মত অনেক বাবু আছে সেখানে। লুচিপুরী কিরণকে কিছু খাবার খেতে দিল। গাড়ী ডেকে কিরণকে বসিয়ে গাড়োয়ানকে বৃন্দাবন যেতে নির্দেশ দিল। এক ব্যক্তিকে সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে বৃন্দাবন যেতে দেখে কিরণও গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে বৃন্দাবন চলল। গাড়োয়ান ভাবল পাগল—পালাচ্ছে, সে কিরণকে ধরল জড়িয়ে। কিরণ বোঝাতে সে ছাড়ল। বৃন্দাবন পৌঁছে দেখল এক বৃদ্ধ, 'জয় জয় রাধেজিগো চরণ তুহারী' গাইতে গাইতে চলেছে। কিরণ তাকে প্রণাম করল। সেই সাধু কিরণকে জড়িয়ে ধরে গাইতে গাইতে চললো। কোন কথাবার্তা নেই। তীর্থমণির আশ্রমে এসে গোঁসাইজীর আশ্রমের সামনে কিরণকে ছেড়ে দিল। 'এই বাড়ী, বাবাকে আমার প্রণাম জানাইও' বলে চলে গেলেন। গোঁসাইজী ঘরে একা বসে ছিলেন। কিরণ সামনে দাঁড়াতেই তাঁকে কোলে টেনে নিলেন। গায়ে মাথায় সে কি মধুর হাত বোলান। 'ছেলেটি অনেক দিন খায় নাই ইহাকে খাইতে দাও।' কিরণের দেহ-মন শীতল হইয়া গেল। কিরণে হেরিয়া প্রভুর প্রসন্ন হইল মন / ওঠ ওঠ কাছে এস বলিলা বচন।

এইদিনই রাত একটায় দীক্ষা। দীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলেন সারদাবাবু, ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ, কুঞ্জ গুহঠাকুরতা, ললিত ঠাকুরতা ও সরলনাথ। ১৩০২ সাল ১৭ আষাঢ় রবিবার আষাঢ় শুক্লা নবমী, রাত ১টা। গোঁসাইজীর নির্দেশে কিরণ ভাঁড়ার ঘরে বসে নির্জনে সাধন সুরু করল। স্নানাহার ছাড়া ভাঁড়ার ঘরেই বসে একমনে নাম জপ করে চলেছেন কিরণচাঁদ। বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, একটানা তিন সপ্তাহ চলল এই ভাবের ঘোর। একদিন গোবিন্দচকে বসে নাম করছেন—কোন সময়ে কাপড় খুলে গেছে খেয়াল নেই। নাম করতে করতে কুঞ্জে এসে হাজির। অবস্থা দেখে গুরুভ্রাতারা হেসে উঠল। বাহ্যজ্ঞান কিছুটা হল, ঐ অবস্থায় আবার গোবিন্দচকে ছুটলেন। ঘরে গিয়ে যে অন্য কাপড় পরা যায় সে খেয়ালও নেই। এ সময়ে একদিন শ্রীধরবাবু ভাঁড়ারে ঢুকে টপাটপ রসগোল্লা খেতে সুরু করেন, নাম-মগ্ন কিরণের মুখেও 'নে খা' বলে একটা রসগোল্লা পুরে দিলেন। ঠাকুমা এসে দেখলেন রসগোল্লা নেই, কিরণেরই কাজ মনে করে বললেন—বাঃ, এর মধ্যেই দলে ভিড়েছ ?

গোঁসাইজীর সাথে বেড়াতে বেড়িয়ে কিরণ সনাতন গোস্বামীর সমাধি, গোপাল ভট্টের সমাধি প্রভৃতি দর্শন করলো, এ ছাড়া বৃন্দাবনের নানা দর্শনীয় স্থানে গোঁসাইজী কিরণকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। ২৫শে আষাঢ় ১৩০২ কিরণ প্রথম গোস্বামী প্রভুর মধুময় নৃত্য দেখে ধন্য হয়। ৩০শে আষাঢ়ের নগর কীর্তনে সমস্ত নগরবাসী গোঁসাইজীর সংগে নৃত্য করে।

মহা আনন্দের আস্বাদন করল। এই সময় কিরণ, কাঠিয়া বাবা, ময়ুর মুকুট বাবা এবং ছোট পাহাড়ীবাবার সঙ্গে পরিচিত হয়। ১৬-২৭শে শ্রাবণ ঝুলন পুর্ণিমা কেন্দ্র করে কুঞ্জে এক মহাভাব খেলে যায়। বিপিন পাল মশাই ২৪শে শ্রাবণ গুরুদর্শনে বৃন্দাবন উপস্থিত হন। ২৭শে শ্রাবণ গোঁসাইজীর সশিষ্যে কলকাতার পথে বাঁকীপুরে যাত্রা

করেন। সেখানে বহু সাধু সন্ন্যাসী গোঁসাইজীকে দর্শন করতে আসেন। গোঁসাইজী মহাত্মা ভিখনদাস বাবাজীর আশ্রমে ওঁকে দর্শন করতে যান। পরের দিন বাবাজীও গোঁসাই দর্শনে আসেন [রিটার্ণ ভিজিট ?] বাঁকীপুর থেকে কলকাতা ২১শে শ্রাবণ ১৩০২।

হে পুরুষ, এ কী বীজ করিলে বপন।
নিমিষে বন্ধন টুটি
অন্তরে উঠিল ফুটি
অনন্তের অন্তহীন বীণার স্বপন।

আমি যাব না আর ইস্কুলে, / গোঁসাই এখন লও আমায় কোলে। কিরণ বাবুর পড়াশুনা মাথায় উঠেছে। বৃন্দাবন থেকে ফিরে বরিশাল হয়ে বাড়ী এসে আবার গুরুভ্রাতাদের কাছে ঘুরতে সুরু করলেন। আড়িয়ালে মাখনদের বাড়ী, বানরিপাড়ায় কুঞ্জ কুসুমের কাছে, দক্ষিণাবাবুর কাছে ঘুরে ঢাকায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হল কিরণচন্দ্র। আঠারো বছর বয়স কি ভীষণ, মাঘের প্রথম থেকেই সে গেণ্ডারিয়ায়। গোঁসাইজীও শেষবারের মত গেণ্ডারিয়া বাস করছেন। 'আজ ধুলট উৎসব উপলক্ষে ভক্ত সমাগমে নিত্যোৎসবময় আনন্দপুঞ্জ মহোৎসবে পরিণত হইয়াছে। আশ্রমের ভিতর ও বাহির প্রাঙ্গণে বড় দুটি চন্দ্রাতপ এবং স্থানে স্থানে ছোট বড় অনেকগুলি তাঁবু বসানো হইয়াছে। দ্বারে দ্বারে মঙ্গল ঘট। কদলী বৃক্ষ, আম্রপল্লব, যেমন মঙ্গল রাগে দশদিশি জাগে। আশ্রমের দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখে, পশ্চিম প্রান্তে কালজাম বৃক্ষের নিম্নে বাঁশের চাটাই ও বস্ত্রের দ্বারা একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপ রচিত হইয়াছে। ঐ মণ্ডপে তিনখানা আসন বসান হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত এই তিন প্রভুর তিনখানি পটচিত্র বসান হইবে। বাসন্তী পঞ্চমী তিথি হইতে উৎসব আরম্ভ হইবে। কলিকাতা হইতে মনোহর দাস বাবাজীর দল ও মুকুন্দ ঘোষের কীর্তনের দল আসিবে। সব আয়োজন পরিপূর্ণ, বহুমুর্তি ভক্ত শিষ্য সপরিবারে আশ্রমে আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। ভক্ত সমাগমে আশ্রমটি ভরপুর, জমাট আনন্দে গরগর অথচ একটুকু শব্দ নাই মুদ্রিত নয়ন সাধকবৃন্দ আপন আপন আসনে অন্তরটানে মগ্ন স্থির। বিচ্ছুরিত সঞ্চারী শক্তিতে শান্ত সমাহিত সুগম্ভীর।

বরিশালবাসী ভক্তবৃন্দ, ত্রিশমূর্তি তাঁরা দু'খানা বড় পানসী নৌকা করিয়া খোল করতাল সহ কীর্তন করিতে করিতে নদীপথে ঢাকায় রওয়ানা হইয়াছেন। দিবারাত্রি নৌকা চলিয়াছে। আহারের সময় হইলে নদীর চরে নৌকা লাগাইয়া রসুই করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়া যখন ভোগ আরতির কীর্তন হইত চারিদিক হইতে লোকসকল ছুটিয়া আসিত। সমবেত লোককে প্রসাদ বিতরণ করিয়া নিজেরাও প্রসাদ পাইয়া নৌকায় উঠিতেন।

মাঘ মাসের সকালবেলা, প্রভু কুটীরে নিত্য নিয়মিত পাঠ করিতেছেন। প্রভুর সুললিত কণ্ঠ ভাবরসে আপ্লুত, কতই মধু বর্ষিত হইতেছে, সকলেই মগ্ন, নিস্তব্ধ। হঠাৎ দিগ্বিদিক আকুল করিয়া খোল করতালের মধুর মাতোয়ারা শব্দ বুড়ী গঙ্গার দিক হইতে প্রবলবেগে উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন ও ভক্তবৃন্দের আনন্দোচ্ছ্বাস, হুঙ্কার মহামাদক তাণ্ডবধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।

কীর্তন ক্রমশঃ আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে পারিয়া অনেকেই ভাবাবেগে উঠিয়া আশ্রমের দক্ষিণপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর সুমধুর স্বরলহরী, আনন্দ জড়িমায়, ক্রমশঃ ক্ষীণ ও গদ গদ হইয়া উঠিল। অবশেষে পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। প্রভু গ্রন্থের বস্ত্রাবরণ দিতে চেষ্টা করিতেছেন, হস্তের অঙ্গুলী যেন গ্রন্থিচ্যুত ও অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। বস্ত্রাবরণে সমর্থ হইতেছেন না। কোন মতে গ্রন্থখানা আসনের উপর রাখিয়া, প্রভু সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

আশ্রমের চতুর্দিকস্থ সাধনপল্লীর নরনারী যাদের সদাই প্রেমরসে উচ্ছ্বসিত চিত্ত, সংকীর্তন বাত্যায় উত্তাল তরঙ্গে আলুকিত তাঁরা ছুটিয়া আসিলেন আশ্রমে। এলোমেলো কেশ-বেশ, কি এক উন্মাদনা, কীর্তন আশ্রমে উপনীত হইল, বাত্যা বন্যায় পরিণত হইল। বানরীপাড়ার হেডমাষ্টার মহাশয় (দুর্গামোহন পণ্ডিত মশাই?)

কুটীর দ্বারে প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ভক্ত শ্রীধর ঘোষ তাঁহার পিঠে উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নাচিতে নাচিতে একবার যান তাঁহার মাথার দিকে আবার ঘুরিয়া যাইতেছেন পায়ের দিকে। বাইসারীর বিপিনবাবুটি প্রণাম করিতে যাইয়া তাঁহার বামহস্ত ও বামপদ রহিল মাটিতে, দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হইয়া রহিল শূন্যে। পটে অঙ্কিত চিত্রমূর্তির মত তিনি আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন স্থির অবিচল, সরলনাথ বাবুটির জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, হাত পা পিণ্ডাকার হইয়া গেল। তিনি বাঁকিয়া গোলাকার হইয়া অদ্ভুত বলের মত ঘুরিতে লাগিলেন। কীর্তন চলিল—ভাবরসের ঘুর্ণিপাকে সিদ্ধহস্ত বাদক প্রসন্ন ঠাকুরতা মহাশয়ের হস্তপদ জড় হইয়া গেল। তিনি চেষ্টা করিয়াও হাত দু'খানা মৃদঙ্গে লাগাইতে পারিতেছেন না—বাদ্য অচল। কীর্তনের রসভঙ্গ হওয়ায় বিধু ঘোষ মহাশয় এক লম্ফে ধুপ করিয়া পড়িলেন কীর্তনের মধ্যে। তাঁহার মুষ্ট্যাঘাতে খোলটিও চূর্ণ হইয়া গেল ('নিত্যানন্দ ভেঙেছে'—গোঁসাই), বাদকটিও পড়িয়া গেলেন মাটিতে কাষ্ঠবৎ সম্বিতহারা। শশী সাহা মহাশয় তাড়াতাড়ি আশ্রমের খোলটি লইয়া বাজাইতে লাগিলেন। গানের ও বাদ্যের পর্যায় ভঙ্গে প্রভুর আনন্দের ক্ষণিক বিঘ্ন, প্রভুগতপ্রাণ বিধু ঘোষের তাহা সহ্য হইল না। তাহার বুক চাপড়ান হুঙ্কার, আস্ফালন, আসমান-ধরা লম্ফ, মালসাট, একবার যান দক্ষিণের ঘরের সামনে আবার একলম্ফে ছুটিয়া আসেন কীর্তনে, প্রভু অবিচল সমুদ্রের মত সমাধি নিমগ্ন। সঞ্চারী শক্তির প্রবল ঝঞ্ঝায় কি যে হইতে লাগিল তাহা বর্ণনাতীত। এ যেন পলকে প্রলয়।

ধীরে ধীরে কীর্তন সমাপন হইল। কিয়ৎ কালান্তর প্রভুর সমাধি ভঙ্গ হইল। সদ্‌গুরুর অমৃতবর্ষী দৃষ্টিতে সর্বসন্তাপের হরণ হয়। হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া যায়। প্রভুর স্নেহবর্ষী সম্ভাষণে বরিশাল-

বাসীগণ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আজ হইতে মহামঙ্গল ধূলট মহোৎসব আরম্ভ হইল।"

"অদ্য ৫ই মাঘ (১৩০২) আশ্রমে বৈকালবেলায় কীর্তন আরম্ভ হইল। সন্ধ্যায় ঠাকুর কীর্তনে নৃত্য করিলেন। নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুরের অপূর্ব ভাবের বিকাশ হইল। তিনি ত্রিভঙ্গ হইয়া, হাত দু'খানা, ঠিক যেন বাঁশী ধরিয়াছেন, এইভাব করিয়া রাখিলেন। মস্তকের জটা আপনা হইতে উঠিয়া ঠিক চূড়ার মত হইয়া রহিল। তিনি মুখে বম্ বম্ বলিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন।" কিরণ গোঁসাইকে হরিহররূপে দর্শন করল।

মাঘের ছয় তারিখের বিকেল থেকে মুকুন্দ ঘোষের কীর্তন সুরু হল। রাত্রে গোঁসাইজীর নৃত্য সুরু হল। রাধা ভাবের নৃত্য। কিরণ অবাক হইয়া গেল। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর রাধাভাবের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, এই নৃত্য যেন তাহার চেয়েও মধুর। রাত্রে কিরণ গোঁসাইজীর প্রসাদ পেতে গেল। যোগজীবনবাবু বললেন, গোঁসাই কাকেও প্রসাদ দিতে নিষেধ করেছেন। কিরণ সে কথা শুনবে কেন। গোঁসাইজীর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি নাকি আমাদের প্রসাদ দিতে নিষেধ করেছেন?" গোঁসাই উত্তরে বললেন—"হ্যাঁ, প্রসাদ দিতে পার তো নিতে পার।" কিরণকে বিষণ্ণ দেখে বললেন, "প্রসাদ অর্থ প্রসন্নতা, প্রসাদ অর্থ পাতের উচ্ছিষ্ট নয়। রোজ রোজ আমার পাতের উচ্ছিষ্ট খেলে কি হবে। এরা আমার প্রভাতী চা থেকে যা অবশিষ্ট থাকে তা প্রসাদ বলে ভাগ করে খাচ্ছে। এরপর আমি মরে গেলে আমার ফটোর কাছে চা দিয়ে সকলে প্রসাদ পাবে—এ সব কুসংস্কার।" গোঁসাইজীর কথায় কিরণের কান্না পেয়ে গেল। আমতলায় গোঁসাইজীর আসনের কাছে এসে প্রাণ খুলে কাঁদল খানিকটা। "ঠাকুর তোমার প্রসাদ খাব না তো কার প্রসাদ খাব। তুমি

ছাড়া আমার আর কে আছে, আমি কোন দেবতা মানি না ঈশ্বর পর্যন্ত আমার চাই না,—শুধু তোমাকে চাই। তুমিই আমার সর্বস্ব। তুমি যদি নিষ্ঠুর হও, নির্দয় হও তবে আর কে দয়া করবে?" কেঁদে একটু শান্ত হয়ে কিরণ প্রতিজ্ঞা করল প্রসাদ না পাওয়া পর্যন্ত আহার করবে না। মনের দুঃখে কিরণ শুতে গেল। রাত্রে গোঁসাইজী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—"তুমি এত ব্যস্ত হলে কেন। প্রসাদ অর্থে প্রসন্নতা লাভ করা। আমি তো তোমাদের উপর সর্বদাই প্রসন্ন। তোমরা অপরাধ করলেও আমি অপ্রসন্ন হই না। আমার প্রসাদ খাবার দরকার কি?" কিরণ কেঁদে বলল—"না ঠাকুর আমাকে প্রসাদ দিতে হবে।" গোঁসাইজী বললেন—"এতই যদি আগ্রহ তবে প্রসাদ খেও।" কিরণের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

পরের দিন ঠিক প্রসাদ আনতে গেল। আজ যোগজীবনবাবু কোন আপত্তি করলেন না। কিরণ খেতে বসেছে। গোঁসাইজী এসে বারান্দায় বসলেন। কিরণের দিকে চেয়ে মৃদু মধু হাসতে লাগলেন। আজ কি আনন্দ—নিরানন্দ জীবনে, এল সুখ-তৃপ্তি ভেঙ্গে সুপ্তি-স্বপনে।

ধূলট উৎসবের সঞ্চারীভাব গোঁসাইজীর নৃত্য, নগর সঙ্কীর্তন, গোঁসাইজীর সমাধি এবং গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গ কিরণকে ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিল। ৯ই মাঘ গোঁসাইজী কিরণকে মাখনবাবুর ছোট বোন সরোজবালাকে বিবাহ করতে নির্দেশ দেন। মনে হয় কিরণ নিজেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।

গেণ্ডারিয়া থেকে আড়িয়াল। সরোজকে বলতে হবে, জানাতে হবে গোঁসাইজীর নির্দেশ। সরোজবালাও প্রতিজ্ঞা করলো কিরণকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। ১৮ই মাঘ ১৩০২। আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে গোঁসাইজীর চিঠি পেয়ে সে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে গোঁসাইজীর কাছে এসে উপস্থিত হল।

গোঁসাইজী বিয়ের দিন ঠিক করে তাকে খালিয়া পাঠিয়ে দিলেন। ১৩০৩ সালের ২৫শে আষাঢ় গোঁসাইজীর নির্দেশ মত ছয়দণ্ড রাত্রির পরে শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা দেবী সরোজবালার সহিত ৺কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শুভ পরিণয় কার্য সম্পন্ন হইল।

বিয়ে হলে কি হবে কিরণ যে কে সেই রয়ে গেল। গোঁসাই, গোঁসাই। এক রাতে স্বপ্ন দেখল গোঁসাইজী বলছেন—এই দেখ তোমার গত সাতশ' বৎসরের জীবন—আর এই তোমার ভবিষ্যত। "দেখিলাম আমি কৌপিন সম্বল করিয়া ভারতের তীর্থে তীর্থে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। তাহার পর আসিলাম কাশী, সেইখানেই আমার শেষ বিশ্রাম।" পরবর্তী জীবনে এ স্বপ্ন সত্য হয়েছিল। আশ্বিন মাসে আবার কলকাতায়। এবার গোঁসাইজী হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে। মাত্র আট দিন গোঁসাই সঙ্গ করে খালিয়ায় ফিরতে হল—"মা তোমাকে দেখবার জন্য উতলা হয়েছেন, বাড়ী যাও"—গোঁসাই বললেন। টেলিগ্রামে যদিও মার ভীষণ ব্যারামের কথা ছিল। বৃন্দাবনে দীক্ষার পর কিরণ এ যাবত সব মিলিয়ে নব্বই দিন গোঁসাইজী সঙ্গ করল। খালিয়া এসে দেখে মা বেশ ভাল আছেন, সর্বদা গোঁসাইজীর জন্যে কিরণের মন ছটফট করতে থাকে।

'সরোজ ধীর, স্থির, প্রশান্ত। বিক্ষোভহীনা, তাড়ানাহীনা, ধরিত্রীর মত সহনশীলা, সদাহাস্যময়ী নীরব প্রতিমা। তাহার দিকে তাকাই আর মনে মনে প্রণাম করি। আমার জীবনও এমনই শান্ত করিয়া দাও ঠাকুর।'

আশ্রমমাতা মা

কেমন করে পরের ঘরে থাকিস্ উমা বল মা তাই, মা, কেমনে সহ্য করে—জামাই নাকি ভিক্ষা করে, এবার নিতে এলে পরে বলব উমা ঘরে নাই। যাঁর স্বামী সন্ন্যাসী, তাঁর কেমন লাগে? তাঁর যে দিনরাতের প্রভেদ থাকে না। সাধুরা বলবে, 'ওহে মানুষের মন নিয়ে ওঁদের বুঝতে যেও না। নুনের পুতুল হ'য়ে সমুদ্র মাপতে যেও না।' একটা গল্প মনে পড়ল—শিষ্য আরতি করছে, ভাব উঠেছে, গোঁসাইজীর সামনে ধুনুচি নিয়ে নাচছে। গুরু আরতি দেখছিলেন, ধমকে থামিয়ে দিলেন শিষ্যটিকে। "এই গরমে তোমার মুখের সামনে আধঘণ্টা ধ'রে আগুন নিয়ে নাচলে কেমন হয়?"

প্রয়াগে সন্ন্যাস নিয়ে দরবেশজী চারধাম সহ ভারত ভ্রমণে বেড়িয়েছেন। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী। মনে পড়ল গোঁসাইজীর কথা—"তুমি ফকির ছিলে, ফকির হইবে।" আগ্রায় এক সাহেব তাকে দরবেশ সম্বোধন করল। বহুদিন আগে গোঁসাইজীও তাকে রঙবেরঙের তালি দেওয়া জামা পরতে দেখে বলেছিলেন, 'বেশ দরবেশটি সেজেছ।' সেই থেকেই দরবেশ—কৈশোরানন্দ সরস্বতী নয়, কিরণচাঁদ দরবেশ।

ভ্রমণ এই প্রথম নয়। সন্ন্যাসের আগেই ১৩০৮ সালে গুরু-ভ্রাতাদের সঙ্গে দরবেশজী দক্ষিণভারত ভ্রমণ করেন। সাথে ছিলেন অমৃতলাল সেন সহ আরও ছ'জন গোঁসাই শিষ্য। বেজোয়াদায় তার পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে। পাহাড়ের ধারে গুহা ইত্যাদির কথা বলায় অমৃতবাবু গিয়ে দেখে আসেন সত্যই সেখানে এক ফকির

ছিলেন। ফকিরের স্মরণার্থে উৎসব তখনও চলছে—এবার সঙ্গী শত্রুঘ্ন শরণ। শত্রুঘ্নশরণের গুরু সৎগুরুশরণ, গুরুর আদেশে নৈমিষ্যা-রণ্যে আশ্রম করেন। সৎগুরুশরণের অযোধ্যার আশ্রমে গোঁসাইজী দু'দিন ছিলেন। তখনও আকাশ-গঙ্গার সন্ধান পান নাই। গুরুজী, সৎগুরুশরণ ও অন্যান্য শিষ্যদের গোঁসাই সম্বন্ধে বলেছিলেন,—"ইনি বড় মহাত্মা। নিজে কি তা এখনও বুঝতে পারছেন না। গুরু গুরু করে বেড়াচ্ছেন।" সৎগুরুশরণ নৈমিষ্যারণ্যের আশ্রম দরবেশজীকে দান ক'রে যান। দরবেশজী শত্রুঘ্নশরণকে তা দান করেন। দরবেশজী গুমারে গুরু দত্তাত্রেয়ের পদচিহ্ন দর্শন করেন। দত্তাত্রেয় সদ্‌গুরু ছিলেন। তাঁর পদচিহ্ন গোঁসাইজীর পদচিহ্নের মত। এক মাপ। এই ভ্রমণে গোঁসাইজীর অনেক সন্ন্যাসী-শিষ্যদের সঙ্গে দেখা হয়। এরা কুম্ভমেলার শিষ্য। ভ্রমণকাল ১৩১৯-১৩২১।

মা এই সময় কখনও খালিয়ায়, কখনও বা পিতৃগৃহে। বাপের বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী এখন সকলই গোঁসাইর বাড়ী হয়েছে। ১৩০৪ সালে অমলবাবু গোঁসাইজীর কাছে সাধন পেয়েছেন। তার স্ত্রী যোগজীবন গোস্বামীর শিষ্যা। সেবাপূজা, ভজন কীর্তন নিয়ে আছেন। হরিসে লাগি রহরে ভাই। সদাই হরিবোল, মধুর হরিনামের নাই তুলনা। যদি বিষয়েতে সুখ হত তবে রে লালাজি ফকির হ'ত না। কিন্তু দৃশ্য-গন্ধ-গানের আনন্দের মাঝখানে মা আমার অন্তঃহীন বেদনাধারা নিঃশব্দে ব'য়ে চলেছেন। নিজ সুখের জন্য নয়, দরবেশের মঙ্গল কামনায় মা বেদনার আকাশ প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। প্রিয়জনের অশুভ আশঙ্কাই স্নেহের স্বাভাবিক ধর্ম। দরবেশের এই যে সন্ন্যাস এ তো মা জানতেন। 'আমিও জানি তোমার ভবিষ্যত কি হইবে', 'ঝড়ের ভিতর দিয়া যাইতে পুরুষের ভয় করিলে চলিবে কেন? ঠাকুরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সব কাজ কর।' এসব কথায় দরবেশকে মা'ই তো শক্তি যুগিয়েছেন। সব পাখী ঘরে ফেরে,

দুর্যোগে সবাই ঘরে আশ্রয় নেয়, তখন পথের মানুষটার জন্য ম
আনমনা হ'য়ে যান। গোঁসাইজীর কৃপায় মা যখন অন্তরে নতু
নতুন আনন্দ আস্বাদন করেন তখনও।

ঢাকা ফুলবেড়িয়ার জ্ঞানচন্দ্র সাহা, ময়ূর মুকুট বাবার শিষ্য
মহাপ্রভুর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করবেন জ্ঞানবাবু। মহামহোৎসবের আয়োজ
হয়েছে। সেই উৎসবে দরবেশজীকে পূর্ববাংলার গোঁসাইগ
নূতনরূপে দেখতে পায়। স্বরূপে, সহজাভিরূপে, গোঁসাই অনুরূপে
এবং একরূপে।

১৩২১ সাল। দরবেশজী খালিয়া এসেছেন। বড়বাড়ীর সন্ন্যেসী
ছেলে বাড়ী এসেছে। না, কোনো ছোপানো কাপড়-টাপড় নয়
বসন রাঙানো যোগী নয়। সাদা কাপড় পরেন, ঘড়ি ধ'রে চলেন
বই পড়েন খুব। যদুনাথ বিশ্বাস ঐ অঞ্চলের লোক—বললেন, ঠাকুর
আমায় সাধন দাও। দরবেশজী সাধন দেওয়ার বিরোধী, ব্রহ্মচারী
যে সাধন দিচ্ছে এতেও সায় নেই তাঁর। যদুর কান্নাকাটি দেখে
বললেন,—আমি টাকা দিচ্ছি, তুমি ব্রহ্মচারীর কাছে যাও। আমি
সাধন দিই না—আদেশও নেই। যদুর কান্নার বিরাম নেই।
দরবেশজীও নাচার। রাতে গোঁসাইজী দর্শন দিয়ে বললেন—'যদুকে
সাধন দাও।' পরের দিন যদু আবার এসে হাজির। কি যদু, কি
খবর? আবার এলে যে, কথা শুনে যদুনাথ আশাভঙ্গের বেদনায় ভেঙে
পড়ল—বললো, 'তবে যে গোঁসাইজী আমাকে কাল রাতে দেখা দিয়ে
বলে গেলেন, আপনাকে দীক্ষা দেবার জন্য বলেছেন।' দরবেশজী
যদুনাথকে নাম দিলেন। গোঁসাইজী আবার দেখা দিয়ে বললেন,—
এভাবে নয়, যেমনটি পেয়েছো—বিধিনিষেধ, নাম, প্রাণায়াম, প্রণালী
মত দীক্ষা দাও।' ঠাকুর এরপর প্রণালী মত সাধন দিলেন।
কাশীতে গুরুস্থানে গুরু-সন্নিধানে যদুনাথ দেহত্যাগ করেন। সে
অনেক পরের কথা।

এরপরে কাশী—মদনপুরী, নাথু সাহু ব্রহ্মপুরী, হারাবাগ ও শেষে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ। ১৩২২ থেকেই কাশীবাস। সাথে মা, মা'র বরিশালের পুরনো এক সহচরী মহিলা (মাসিমা), পরে শচী, অবলা, সুকুমারী, সুনীতি, যোগানন, নিকুঞ্জ, গোবিন্দ, জীবন, নরোত্তম, বাহাদুর, আরো কত।

১৩২২ সাল। দুই নম্বর নাথু সাহু ব্রহ্মপুরীতে এলো যোগেশ ও প্রতিভা। মা ওদের আপন ক'রে নিলেন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখেছেন—ঠাকুর তো কাছে ছিলেনই। পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণীও লম্বা ঘোমটা টানিয়া ঠিক আমারই সামনে বসিয়া অন্নপূর্ণার রূপ ধারণ করিয়া প্রথম দিনই পরম দুর্লভ প্রসাদ পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। দয়াময়ী মা আমার সেইদিন হইতে আজ ৪৪ বৎসর যাবৎ তাঁহার মহাপ্রসাদ দানে এ দীন আমি-কে ধন্য করিয়া আসিতেছেন। মায়ের কৃপা কি আর বর্ণনায় শেষ করা যায়? মা প্রতিভাকে নিজের ঘরে বসাইয়া প্রসাদ দিলেন। দুই একখানা বই ধরিতেই ঠাকুর বলিলেন—'দরকার মত বই নিয়ে যাবে—বহু গ্রন্থ এখানে আছে।' যোগেশদা তখন রেলের ইঞ্জিনীয়র। এক বৎসর পরে ওঁদের সাধন হয়।

১৩২৩ সালের মহানবমী। দরবেশজীর কাছে আজ সাধন পেলেন নারায়ণগঞ্জের উকিল এবং (আইনের বই) লেখক বসন্তকুমার পাল সস্ত্রীক, পুরুলিয়ার অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক এবং যোগেশ ও প্রতিভা। তখনকার দিনে কুলগুরু ত্যাগ করে সাধন নেওয়া একটা সামাজিক বিপর্যয়ের মতো মনে করত অনেকে। সদ্‌গুরু জাগ্রত হ'লে চিহ্নিতের দল না এসে পারবে কেন? মা যোগেশকে বললেন,—'যখন তোমার 'নাম' শুনলাম, মনে হ'ল সাক্ষাৎ ঠাকুর তোমাকে কৃপা করলেন।'

সরিফাবাদ। ১৩২২ থেকেই ফরিদপুরের সরিফাবাদ গ্রামের

মানুষ দরবেশজীর সংস্পর্শে আসেন। ভৌমিকদের আগ্রহেই এই গ্রামে দরবেশজীর পদার্পণ। ১৩২৪ সালে শশধর মিত্র মহাশয় সস্ত্রীক সাধন পান। ১৩২৫-এর বৈশাখে দরবেশজী সরিফাবাদ আশ্রম স্থাপন করেন। কিছুদিন হ'ল 'মন্দির' রচনা শেষ হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দরবেশজী মাঝে মাঝেই সরিফাবাদ আসতেন। এই আশ্রমে তিনি 'ভজ গুরু গৌরাঙ্গ রাধাগোবিন্দ/ব্রহ্ম নারায়ণ হরে কৃষ্ণরাম' নাম দর্শন করেন। 'ওরে প্রেমের গাঙ্গে রঙ্‌বেরঙের জোয়ার এসেছে' ও এখানকার রচনা। পরিষ্কার সরলপ্রাণ নিকুঞ্জদা (ভৌমিক) এবং ডাঃ প্রভাত ভৌমিক মহাশয় এই সময় সাধন পান। মেদিনীপুরের কাস্তোরে দরবেশজী পরে আরেকটি আশ্রম করেন।

দরবেশজী মাঝে মাঝে পুরী যান, সরিফাবাদ যান, কলকাতা, ঢাকা, হিমালয়, ভ্রমণ করেন। নবকলেবরে গোঁসাইজী কৃপা বর্ষণ করেন। মা কাশীতে সেবাপূজায় ব্যস্ত থাকেন। আদরে, শাসনে অগণিত ছেলে-মেয়েদের ঠিক পথে নিয়ে চলেন। দরবেশজী কাশীতে না থাকলে অন্যদের মন ভরে না। ব্রজ কি সেই ব্রজ থাকে? মঠ-বাসীদের মন মানে না। 'আজ সকাল হইতে দিনটা বড়ই নিরানন্দে কাটিল। শরীরটাও ভাল না। আজ ঠাকুর কাছে নাই, যেদিকে চাই সবই যেন শূন্যময় মনে হইতেছে। মনে হয় কতকাল ঠাকুরকে দেখি না। ঠাকুর তুমি আমার প্রাণের দেবতা। তোমায় ছেড়ে আর কতকাল এভাবে থাকব। ২৪. ১. ১৩৩০। স্বপ্নে দেখিলাম—আমি কাঁদিতেছি। ঠাকুর এসে আমায় ডাকলেন,—'তুই এত কাঁদছিস কেন?' আমি কিছুই বললাম না। ঠাকুর আমায় আদর ক'রে কত খেতে বললেন।

অস্থির লাগছে। শরীর ভালো ছিল না, মা'কে হাওয়া দিতে বললাম। হঠাৎ দিনের বেলায় মায়ের দেওয়া হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম ঠাকুর। পাঠ করছেন। আমাকে

বললেন, 'ইষ্টনাম জপ কর'। ২৭. ১. ১৩৩৩ আজ গোঁসাইয়ের তিরোভাব তিথি। ভোগের বিষয় লইয়া বড়ই চিন্তা হইয়াছিল কারণ ঠাকুর এখানে নাই। মনে করিয়াছিলাম, রান্না ভালো হবে না। কারণ, ঠাকুর শক্তি দেন। আমার কোনই শক্তি নাই। তারপরেই মনে করিলাম ঠাকুর বলছেন—'ঠাকুরকে রান্নার আগে দণ্ডবত কর, তবেই সব ঠিক হবে।' তাই করলাম। ঠাকুরের কৃপায় রান্না ভালোই হল। সারাদিনটাই ঠাকুরকে কতবার মনে পড়িল তা ঠাকুরই জানেন। মা'ও ভোগ আরতি করতে করতে কেঁদে ফেললেন। তখন আমারও খুব কান্না এলো।

দুপুরে রান্নার পর পূজা করতে বসলাম। বেলা হইয়াছিল বলিয়া মায়ের উপর একটু রাগ হইল। বসিয়া নাম করিতেছি, দেখিলাম ঠাকুর ও যোগেশদাদা এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন। চারটার সময় উপরে ঠাকুরের ঘরে গেলাম। তখন ঠাকুরের ব্যবহার করা পাটিটা যাহা আমাকে দিয়াছেন, উহা পাড়িলাম এবং একটু আরাম পাইলাম। ২৯শে বৈশাখ।

আজ ঠাকুরকে এমনভাবে মনে পড়িল যে, ঠাকুরের মুখখানা কবে দেখিব। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ঠাকুর আর পারি না। আমায় সহিতে দাও, ধৈর্য্য দাও। ঠাকুরের ঘরে গিয়া কাঁদিলাম। ঠাকুর আমার সহিত কত কথা বল, আজ একটা কথাও কেন বল না, বুঝেছি আজ অন্যায় করেছি, মায়ের উপর রাগ ক'রে ২।১ গ্রাস ভাত খাইয়াই উঠে পড়েছিলাম। পরে মাকে বলেও ছিলাম যে রাগ করেছি। সন্ধ্যার সময় মা ও যোগেশদার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলাম। ১লা জ্যৈষ্ঠ। চারটার সময় ঠাকুরের চিঠি এল। আজ কত আনন্দ, শূন্য প্রাণটি যেন পূর্ণ হইল বলিয়া মনে হইল। কি যেন একটা অমূল্য রত্ন পাইলাম। হায় ঠাকুর তুমি আমার প্রাণ। ৮ই

জ্যৈষ্ঠ দেখলাম সুন্দর একটি বাড়ী—ঠাকুর, আমি, যোগেশদাদা আমরা সকলে গিয়েছি। আমি যেন মায়ের কোলে বসেছি। মাকে জড়িয়ে ধরেছি, একেবারে মায়ের সঙ্গে মিশে আছি। ঠাকুর ও যোগেশদা সামান্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন। ঠাকুর হাসছেন, আমি মায়ের মুখে মুখ লাগাইয়া আছি।—একটু পরে মায়ের মূর্তি যেন বদলাইয়া ঠাকুরের মূর্তি হইয়া গেল। ১০ই জ্যৈষ্ঠ। মা ছুঁইতে না পারায় আমাকেই পূজা করিতে হইল। একমালা প্রাণায়াম করিবার পর নাম করিতেছি—দেখি নিকুঞ্জ ও শেখরদাদা অসি ঘাটে গিয়েছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে উঠেছেন। নিকুঞ্জ বলছে—এইখানে জগন্নাথ দেব আছেন—ছাখো। আমি দেখলাম। ২০শে জ্যৈষ্ঠ। পূজা করিতে করিতে দেখিলাম নিশিকাকা মাকে বলছেন অন্নপূর্ণার পূজা দেওয়া যায় না? আমার অনেক দিন হইতে পূজা দিতে ইচ্ছা হইতেছে। মা বলিলেন, কেন দেওয়া যাইবে না, নিশিকাকা বলিলেন কি দিয়া দিব। মা বলিলেন, শাঁখা দিন, প্রকারান্তরে মনে হইল মাকেই অন্নপূর্ণা মনে করিয়া শাঁখা দেবেন। ২১শে জ্যৈষ্ঠ। স্বপ্নে দেখিলাম, ঠাকুর না খেয়ে লাঠি হাতে ক'রে কোথায় চলে গেলেন। ইতিমধ্যে নিকুঞ্জ এসে বলল, "আমায় ভাত খেতে দাও।" উহাকে খেতে দিলাম। মা উহাতে রাগ করিতে লাগিলেন।—তুই ঠাকুরের আগে খেলি কেন? কাল একাদশীতেও গোঁসাইয়ের আগে খেয়েছিলি। হঠাৎ মনটা আনন্দে ভরে গেল। মনে হল ঠাকুর শীঘ্র আসবেন। ২৮. ২। দেখিলাম, ঠাকুর আমার কাছে এসেছেন এবং আমাকে আলুবোখরার চাট্‌নি রান্না করিতে বলিতেছেন। দুপুরে রান্না করিলাম। হঠাৎ ঠাকুরের লাঠির শব্দ পাইয়া মনে করিলাম ঠাকুর এসেছে—দেখি একজন বৈষ্ণব। ৩২. ২। ঠাকুর আসিয়া নোট দিতেছেন। নোট নিয়া রান্নাঘরে আমায় দিতে

গেলেন, তাড়াতাড়ি পূজা করিয়া মা এলেন, আমি গোঁসাইয়ের ঘর পরিষ্কার করিতেছি, গোঁসাই-এর কাছে গেলাম। খুবই সুন্দর দেখিলাম। আমার হাসি আসিল, ইচ্ছা হইল, গোঁসাইএর মুখে একটা চুমা খাই। আমার অপরাধ ক্ষমা করো ঠাকুর। ২রা আষাঢ়। আজ পত্র এল ঠাকুর শীঘ্র আসিবেন না। মনটা খারাপ হইয়া গেল। ঠাকুরকে বড়ই দেখার ইচ্ছা, কি করি বুঝি না। ৮ই আষাঢ়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি কথা বললেন। খুব ভালো লাগলো। আমাকে ও অবলাকে দুজনকেই বললেন, "তোমাদের এবার চরম হয়েছে, আরেকটু হলেই প্রেম আসে, এর থেকেই প্রেম হয়। এর সঙ্গে একটু নাম হলেই হয়। না হলেও হ'য়ে যাবে। আমি তোমাদের আগুনের ভেতর দিয়ে এনেছি, তোমরা তো কিছুই টের পাও না। আমি বেঁচে থাকতে টের পাবেও না। পরে বুঝতে পারবে। প্রেম হ'লে ভিতরের ভাব নিয়ে মশগুল হ'য়ে থাকা যায়। কোন অভাব থাকে না। আমি বললাম— "আপনি এবার পুরী গিয়েছিলেন পর আমার মনে হ'ত আপনি কাছে কাছেই আছেন। অভাব মনে হয় নাই। ১৩৪১, ৮ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার। শ্রীশ্রীঠাকুর খাওয়ার পর বললেন জীবন সোনা হ'য়ে যাবে। আমি আশীর্বাদ করি, আমার কাছে এত রইলে, আমার পায়ে এত তেল মাখালে, জীবনে কখনও কোনও দুঃখ পাবে না। —আমি বলছি। (শচীদির ডায়েরী থেকে; জন্ম ১৩০৩, ১লা বৈশাখ। মৃত্যু ১৩৫৯, ৫ই ফাল্গুন।)

মা'ও মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন। একবার ঢাকায় বসন্তদার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে-মধুদা (মধুসূদন গাঙ্গুলী—মা'কে বৌদি ডাকতেন)। মা একমাস ছিলেন সেখানে। বসন্তদা ও দিদি মাকে খুব সেবাযত্ন করেন। আরেকবার মা, মাখনবাবুর

সাথে পুরী গেলে দরবেশজী তো রেগে আগুন। দরবেশজী তাঁর শিষ্যশিষ্যাদের পুরীর আশ্রমে যেতে নিষেধ করেছিলেন। মা তো আর তাঁর শিষ্যা নন, গুরুভগিনী। মা কেন যাবেন না। দরবেশজীর শিষ্যেরা তাঁকে বোঝালে তিনি শান্ত হন। ১৩৪৬।

দিনাজপুরের সুরেন বিশ্বাস কাশী এসেছেন। মা সম্বন্ধে একটু ভয় নিয়েই। কিন্তু মায়ের স্নেহে দু'দিনেই বুঝতে পারলেন, বাবার সঙ্গে মা'ও একটি পেয়েছেন কাশীতে। পরে কলকাতায়ও মা'র হাতে প্রসাদ পেলেন তিনি। উৎসব শেষে এসেছে সুরেন। ভালো ভালো প্রসাদ সব শেষ। একটু বকে মা একহাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে এলেন। সুরেনকে খাওয়াবেন বলে। সুরেন বলল—কিছুই নেই বললেন আবার নিয়েও এলেন এ্যাতো সব। গোঁসাইজীর জন্য রেখে ছিলাম রে। তা গোঁসাইয়ের জন্য রাখা মিষ্টি আমাকে দেবেন? তাতে কি? কাল গোঁসাই কত খেয়েছেন, আজ তুমি খাও। তুমি কি গোঁসাই নও, তুমি কি গোঁসাই ছাড়া। ঠিক আরেকটি বঙ্গ-নারীর কথা নয়। সদগুরু শিষ্য করেন না, গুরু করেন।

১৩৪২ সাল। হারাবাগের বাড়ীতে শেষ উৎসব। মঙ্গলদাসজী এই প্রথম কাশীতে এসেছেন। মঙ্গলদার তখন জ্ঞানবাবুর ভাগ্নে এই পরিচয়। মায়ের রান্না মুখে লেগে গেল। দু'ঘণ্টা ধরে সিদ্ধ করা ডাল, বাটির পর বাটি তাই খাচ্ছেন। মা ভাত দিলেন—পরক্ষণেই পাতা শূন্য। ভাত যেদিন খাচ্ছেন, পনের বিশজনের ভাত নিঃশেষ। ডালের দিকে রোখ পড়ল তো ডালই সই। উপর থেকে দরবেশজী ধমকে উঠলেন, "ওঠ, আর কত খাবি?" মঙ্গল বললেন—তা আশ্রমে এসে একটু ডাল-ভাতও খাবে না। মা বলতেন, "আহা খাক্ না পেট ভরে।" মায়ের ভাণ্ডার যে অফুরন্ত। মঙ্গলদা বলেন—সামান্য জিনিস থেকে সবাইকে খাওয়াতে মা'র মত

আর কাউকে দেখিনি। ছোট্ট বাটিতে বৈকালী প্রসাদ—মা সবাইকে দিলেন। সবাই পেল, বাকী কেউ রবে না, বাদ যাবে না। ওরে শ্রীমা আর মাতা যোগামায়া যে এক। ঠাকুর বলতেন, "ভাখ্ মোঙ্গলা, আমার যা কিছু সব তোর মা'র জন্য।"

রাসবিহারী সাধু আর শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য। ওঁরা দুজনেই এখন বৃদ্ধ। কাশীর কথা উঠলেই এরা মা'র কথা বলেন। রাসবিহারীদা বলেন—কাকাবাবুর নিষেধ সত্ত্বেও মা তাকে ভালো ভালো খাবার খাইয়েছেন। শরৎদা প্রথমে কাশী যান দরবেশজীর আহ্বানে।

'আমরা একই পরিবারভুক্ত শরৎ, আমার ইচ্ছা তুমি কাশী আসিয়া গোঁসাইজীর একখানা ছবি কর।' শরৎদা প্রথমে হারাবাগে, পরে মঠে দীর্ঘদিন ঠাকুর আর মা'র সাথে থেকেছেন। মা'র ছেলেই ছিলেন যেন, সন্ধ্যায় মা'র সাথে কীর্তন করতেন—হরি হে লাগি রহয়ে ভাই, প্রভুজি এই ছা হি নাম তুঁহার।

নলিনী দে ঠাকুরের প্রথম জীবনের শিষ্য। বলতেন, মা'র জন্য আমার বড় দুঃখ হয়, ঠাকুর বড়ই নিষ্ঠুর।

নিকুঞ্জ ভৌমিক, অমূল্য ঘোষ, দীনেশ ঘোষ এরা যেন মা'র পেটের ছেলে। দীনেশের বউ মিনুকে হাতে ধরে সংসারে কার্য শিখালেন মা। প্রভাতের বউ পারুল স্বাস্থ্য ফেরাতে কাশী যায়। শরীর সারিয়ে কলকাতায় ছেলের কাছে পাঠাবেন মা—ওরে তোর বাসন মাজার ঝি আসে তো? ঘরে পাখা আছে তো?

ঠাকুরকে কুকুরে কামড়েছে। এক বৃদ্ধা গুরুভগিনীকে দেখতে শেষ বেলায় বের হয়েছিলেন। 'অন্ধকার সিঁড়ি, কুকুর বাঁধা, দেখতে পাইনি, খুব মাড়িয়ে দিয়েছি। বড় ব্যথা পেয়ে আমাকে কামড়ে দেয়। তার সে কি অনুশোচনা, আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে সে কি কান্না।' ডাক্তার ওষুধ লাগিয়ে দিল। ক'দিনেই সেরে গেল।

আমার দাদা নম্বর বড়ো ধর্মভাব। ছোটবেলা থেকে নিরামিষ খায়। কিছুদিন হ'ল সাধন নিয়েছে দরবেশজীর কাছে। বয়স আঠারো উনিশ। কাশী এসেছে। দু'দিন থেকেই চলে আসবে কলকাতায়। বড় ইচ্ছে ঠাকুরের প্রসাদ পায়। সংকোচে কাউকে বলতে পারল না, বলবেই বা কাকে? বলার মত জানাশোনাও ছিল না কারুর সাথে। মনের বাসনা মনেই রইল। ষ্টেশন যাবার আগে মন্দিরে প্রণাম ক'রে উঠেই দেখে মা একদম মাথার কাছে দাড়িয়ে। বললেন—বাবা, তোমাদের ঠাকুর অসুস্থ, কিছুদিন আগে ওঁকে কুকুরে কামড়েছে। ওঁর প্রসাদ তাই কাকেও দেওয়া হয় না এখন।

মা সম্বন্ধে দরবেশজী বলেছেন—তোমাদের মা রাত তিনটে থেকে স্থরু ক'রে রাত দশটা পর্যন্ত এক হাতে ঠাকুর ঘরে গোঁসাইজী, নাম ব্রহ্ম আর মা ঠাকুরাণীর সেবা করেছেন। কঠোর তপস্যায় যা না হয় এ সেবায় তা হ'তে অনেক বেশী অবস্থা লাভ হতে পারে। তোমাদের মা ঠাকুর ঘরে ঢুকলে আর বের হ'তে চাইতেন না। তিন চার ঘণ্টা ওকে আমি ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখেছি।'

মা সরোজবালা ছিলেন সদগুরু দরবেশজী মহারাজের শক্তি। শক্তি বিনা শিব শব।

শ্বেতাম্বরং শ্বেত বিলেপযুক্তং
মুক্তফল ভূষিত দৈব্যমূর্তিং।
বামাঙ্গ পীঠস্থিত দিব্যশক্তিং
মন্দস্মিতং পূর্ণ কৃপানিধানম॥

'মা রক্তবর্ণা ও রক্তাভরণভূষিতা। রক্তবর্ণে কর্মশক্তি বোঝায়। শ্রীগুরু নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। বামে রক্তবর্ণা শক্তি প্রসন্নচিত্তে বিরাজ করিয়া তাহাকে কর্মে প্রবৃত্ত রাখিয়াছেন। শ্রীগুরুর বাম উরুতে

রক্তবর্ণা শক্তি। অথচ ইহা যুগল নহে। রাধাকৃষ্ণ এবং সশক্তি গুরু একই—অথচ রাধাকৃষ্ণের মত যুগল নহেন।'

শ্রীগুরু এবং শক্তি—এক। মা ও দরবেশজী এক। দরবেশজী মহারাজের দেহাবসানের পরে, মা'কে আমরা তাই সদগুরুরূপে দেখতে পাই। "তুমি সন্তানদের জন্য অধিক বিলম্ব করিও না।" দরবেশজীর এই কথা সত্ত্বেও মা তাঁর নির্দিষ্ট সন্তানদের দীক্ষা না দিয়া দেহত্যাগ করেন নাই।

মন্দির

এই পৃথিবীতে সেই বহিরাগত যে সত্যানুসন্ধানী, দলগত মত মেনে সে শান্তি পায় না। তার মনের মধ্যে ব্যবহারিক জীবনের কোলাহলই বড় হয়ে ওঠে। শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি। সৃষ্টির কারণ কি? কে আমি, কি আমি, ওগো, কেন আমি বিশ্বের মাঝারে, অবিশ্বাস প্রতারণা কেন পূর্ণ সত্যের সংসারে?

কলিন উইল্‌সন্‌ তার 'আউট সাইডার' বা 'বহিরাগত' বইতে অনেক বহিরাগতের নাম করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই সত্যিকারের মানুষ, কেহ বা উপন্যাসের চরিত্র। উইলসনের মতে উপন্যাসের চরিত্র আসলে ঔপন্যাসিকের নিজেরই লেখাচিত্র। লিখে ঔপন্যাসিক ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। এই বহিরাগতের দলে আছেন টি. ই. লরেন্স (আরবীয়), চিত্রকর ভ্যান গগ, কবি ও শিল্পী ব্লেক, জার্মান দার্শনিক নীৎসে, রাশিয়ার ডস্‌টেওভেস্‌কি, কবি র‍্যাঁবো, রীল্‌কে, ইয়েট্‌স, কীয়ার-কেগার্ড এবং কেন নয়—সার্ত। এদের জীবন বড় দুঃখের। সিদ্ধান্ত থেকে সিদ্ধান্তে উত্তরণ কিন্তু অনেকের কাছেই শান্তি এবং আনন্দ ধরা পড়ে নি। কোদাল হাতে কুয়ো খুঁড়ে পিপাসা মেটানোর জীবনান্ত করুণ প্রচেষ্টা। যে মানুষ কবি নয়, ধার্মিকও নয়, সে বোকা ছাড়া আর কি? বলছেন ওদেরই একজন। তবু ইউরোপের প্রচলিত ধর্ম এদের সমস্যা মেটাতে পারেনি। পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার হওয়ায় এ্যালডুস হাক্সলে, ঈশ্বরউড্‌

প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনে সংশয় নাশের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শুধু বুদ্ধি দ্বারা এই মূলসমস্যার সমাধান হয় না। ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।

বস্তুবাদিরা বলবেন এই সমস্যাগুলিই আসলে মিথ্যা সমস্যা। মনোগত। সেই সত্য যা রচিবে তুমি ঘটে যা তা সব সত্য নয়—ভাবুকতা। যা আছে তাই সত্য—অস্তীতি সত্যং। বাস্তবই বিশ্বাসযোগ্য! চুন আর দুধ দূর থেকে একরকম মনে হয় না কি? একটি বোতলে অর্ধেক পানীয়—কেহ বলছে অর্ধেক শূন্য কেহ বা অর্ধেক ভর্তি। মনের মধ্যেই সত্যসন্ধানের ইচ্ছা জাগে—পলকে ঝলকে দেখাও দেয়। আলোর স্বরূপ নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ হিমসিম খাচ্ছেন—বস্তুঅংশ (করপাসকুলার) মত ও মানতে পারছেন না আবার ঢেউ বা ওয়েভ-এর কথাও ওঠেনি। ইরাণের এক কবি কিন্তু তার কবিতায় আলোর সঠিক রূপটি বর্ণনা করেন। জিন বা জীবাংশের ক্রোমোসোমের উপরে বিন্যাসধারা এক্স-রেতে ডাবল হেলিক্স বা দু'টি ঘোরান সিঁড়ির মত ছবি দেখা যাবার পূর্বেই মডেলের সাহায্যে ওয়াটসন ও ক্রীক দেখিয়ে দেন। সুতরাং মনোরাজ্য একদম ফেলনার নয়। আবার সমাজে বাস করতে গেলে সামাজিক নিয়মকানুন মানতেই হবে। সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক মানবগোষ্ঠি সমাজ নয়। কে আমি কি আমির প্রশ্ন হয়ত সবার মনে জাগে না—যাদের মনে এই প্রশ্ন উঠেছে, উত্তর না জানা পর্যন্ত তাঁদের শান্তি কোথায়?

দরবেশজীর 'মন্দিরে' এই সমস্যার উদ্ভব থেকে সমাধান—সুন্দর করে, সহজ ভাষায় সকলের বোধগম্য করে দেখান হয়েছে। শাস্ত্রের কথা সহজবোধ্য কাব্যে, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা যেমন গীতায়। মন্দির তাই সাধারণের শাস্ত্র। বিজ্ঞান বুঝতে যেমন ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়—মন্দিরের রসাস্বাদনও একটু সাধন সাপেক্ষ।

সদ্‌গুরু-সাধনে অনেকের মনে জীবন-সমস্যা দেখা দেয়। সাধনে এবং গুরুকৃপায় তারা সমস্যা সমাধান করেন। এগিয়ে চলেন—পথ চলতে আনন্দ পান, পথের শেষেও। শান্তি নয়, পরিপূর্ণামৃতাস্বাদনম স্বুরু হয়। মনের কাজও ততদিনে শেষ। মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার; শরীর ধর্ম—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য সকলের রূপান্তর ঘটে। সাধক, 'যন্মনসা ন মনুতে যে নাহুর্মনোমতং' তাকে জানতে পারে এবং 'আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।' প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে, মধুর মধুর ধ্বনি হয়। তখন মন্দির পড়লে মনে হয় দরবেশজী আমাদের কী ভালবেসেই না এই বই রেখে গেছেন।

আহার-নিদ্রা-মৈথুনে আর মন ভরে না, অন্য সুখ চাই, যার কোন হ্যাঙওভার নেই। যাতে অবসাদ আনে না। শুধু আনন্দ। এমন দেশে যেতে চাই, যে দেশে ভানুর তাপে দহে না জীবন। চিরবসন্তের দেশ। ভাগ্যবানের মনেই শুধু এই সমস্যা। সে-ই জড়ত্ব, বৃক্ষত্ব, জীবত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ব্রহ্মত্বের স্তর ডিঙিয়ে মন্দির অন্দরে প্রবেশ করতে পারে। লীলার সুরু হয়। নীতি, সেবা, সঙ্গ, আর অনুষ্ঠান, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ, লীলা এই সাতটি সোপান।

আর্ত হও, জিজ্ঞাসু হও, অর্থার্থী হও, সদগুরু সাধন তোমার সকল রকমের সমস্যা, সকল দুঃখ ঘুচিয়ে প্রেমভক্তি এনে দেবে। একে একে এবং একসঙ্গে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর রস আস্বাদন কর।

জড়ত্ব—নীতি

ভাল-মন্দে, সাদা-কালোয় মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান। ঋতু পরিবর্তন, জন্ম-মৃত্যু, ছোট-বড়, হালুইকর ও মিষ্টান্ন সহজেই মানুষ মেনে নেয়। তবে সাধারণত এ নিয়ে সে ভাবতে বসে না। বিশ্ব-প্রকৃতি এক নিয়মের রাজত্ব—সে রাজ্যে মানুষও শরীরবিদ্যার নিয়ম-মাফিক বাড়তে থাকে। কোন সংঘাত নেই, কোন সংশয় নেই।

মনোবিকাশের সাথে সাথে জগতের বৈষম্য, অত্যাচার ও আশা-ভঙ্গের ক্লেশে সে মেনে নেওয়া জ্ঞানকে প্রশ্ন করতে সুরু করে। এক বিরাট জিজ্ঞাসা তাকে পেয়ে বসে—

ওগো সত্য-শাসিত নিত্য ভূমিতে
মিথ্যার কেন বাস?
ওরা প্রবঞ্চনার মঞ্চ-রচিয়া
সুখে থাকে বার মাস।

*   *   *

তুমি ন্যায়বান যদি, তবে কেন ধাতা গর্বের এত জয়?
বৈপরিত্য ও তার মনে প্রশ্ন জাগায়—

কেন সূর্য ঢাকিয়া মেঘ-উত্তরী
চাঁদে কলঙ্ক রেখা?
কেন শিশির-সিক্ত শাখাটি রিক্ত
ময়ূর কণ্ঠে কেকা?
কেন গোলাপ গুণ্ঠে কণ্টক ধন
রমণীর চোখে বিষ,

কেন সাম্য বাসিত রম্য ভূমিতে
কাম্য-কামনা রিষ ?

ঈশ্বরের অস্তিত্বে মানুষ সন্দিহান হয়। মনে ভাবে এ কি অন্ধ-শক্তি, ঘূর্ণিত যেন কুম্ভকারের পাকে ? কিন্তু তাই বা কি করে হবে। পৃথিবীটা যদি হঠাৎ তৈরী হয়ে থাকে (chance creation) তবে প্রকৃতিতে কেন নিয়মের রাজত্ব। প্রসূত ব্রহ্মাণ্ড অণ্ডে এত দীপ্ত জীবনী ফোয়ারা, প্রসূতি কোল শূন্য প্রাণ হীন, নাহি কোন সাড়া ? তা ছাড়া মানুষ তো আর অন্যান্য জীবের মত নয়। ফরাসী দার্শনিক রুশো মানব সমাজে বৈষম্য দেখে একটু মনুষ্যদ্বেশী হয়ে পড়েন এবং প্রকৃতিতে ফিরে যেতে চান। বইখানি পড়ে ভল্‌টেয়ার লেখেন—"মশাই, আপনার নতুন গ্রন্থখানা পড়লাম। আপনার আগে আর কোন লোক মানুষকে পশু প্রতিপন্ন করতে এত বুদ্ধি খরচ করেন নি। সত্যি, আপনার বই পড়ে আমার চার হাতপায় হাঁটতে ইচ্ছে করছে। ষাট বছর আগে ঐ অভ্যাসটি চলে যাওয়ায়, বর্তমানে আমি আর কার্যটি পুনরায় সুরু করতে পারছি না।" মানুষ শুধু ক্ষুধা আর যৌন প্রবৃত্তি দ্বারা চলিত হয় না। মানুষের ক্রমবিকাশ ও উন্নত সমাজ আর মানসিকতার দিকে। জুলীয়ান হাক্সলের সাইকো সোসিয়াল ফেজ অব ইভলিউশন। নিজের সম্বন্ধে এবং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার উপরে তার প্রশ্ন জাগে—কে আমি কি আমি, ওগো, কেন আমি বিশ্বের মাঝারে/অবিশ্বাস প্রতারণা কেন পূর্ণ সত্যের সংসারে ?

সংসারের অবিশ্বাস প্রতারণা এবং বৈষম্যের ব্যাপারে সাম্যবাদি দর্শন এক যুক্তিপূর্ণ মতবাদ প্রচার করেন এবং তারা হয়ত বলবেন বিপ্লবের সাহায্যে জাগতিক বৈষম্য দূর হলে 'কে আমি কি আমির' দ্বন্দ্ব দূর হবে। মন আসলে পারিপার্শ্বিকের দ্বারা তৈরী। হিংসা দ্বারা হিংসাকে উচ্ছেদ করে হিংসাশূন্য, বৈষম্য শূন্য গঠনমূলক আনন্দ

রাজ্যে নিয়ে যাবার কথা বলেন তারা। তবুও জীব সৃষ্টির প্রশ্নটা থেকে যায়। ধরে নেওয়া গেল তাও সম্ভব হল ল্যাবরেটরীতে। তাতেই যে মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে তার বা কি মানে আছে। সকল মানব সমাজ ব্রহ্মবাদী হয়ে যাবে—ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-আনন্দ বেদনা থাকবে না, বিয়োগ ব্যথায় মানুষের মন কাঁদবে না—তা তো হয় না। পাশ্চাত্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অস্তিত্ববাদ চালু হয়েছে আজ প্রায় একশ' বছর, যদিও এর সামাজিক দিকটা এখনো অস্পষ্ট, অনেকেই তবু এর মধ্যে বৃথা জীবন দর্শন খুঁজতে চাইছেন। হালে পানি না পেয়ে এরাও এমন সব প্রশ্ন তুলছেন, বৈজ্ঞানিক অতি-যৌক্তিকতায় এদের বন্ধুরা যা চেপে দিতে চাইছেন। মনঃসামাজিক বিবর্তনে মনকে বাদ দেওয়া যায় না। প্রমাণ অভাবে ঈশ্বরকে বাদ দিলেও সংযম ও স্থিতাবস্থার জন্য যোগ ধর্মের প্রয়োজন। সনাতন ধর্ম-বিষয়ে অজ্ঞতাই ধর্মকে জনগণের নেশাবস্তু মনে করায়। সদগুরু সাধনে প্রথমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। সত্য, সরলতা এবং সংযম—মাত্র তিনটি গুণ থাকলেই হল। সদগুরু সাধনও এক পরিপূর্ণ আনন্দময় রাজ্যে নিয়ে যায়।

কথা হল, বস্তুবাদি দর্শন যে আশ্বাস দিচ্ছে তা এখন পর্যন্ত একান্ত থিওরিটিক্যাল। বাস্তবে যতটা দেখা গিয়াছে তাতে মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখকষ্টের লাঘব হয়নি। সাধনে অনেকেই আনন্দধামে পৌঁছেছেন এবং পৌঁছচ্ছেন।

বস্তুবাদীদের সাথে আমাদের বিরোধ নেই। উদ্দেশ্য এক। সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য কেহ যদি সাধন করেন তাহলেই বা কি ? সমাজে থাকতে গেলে সামাজিক আইন সকলকেই মানতে হবে। সেতার বাজনা, দাবা খেলার মত ধর্মানুশীলনও চলবে।

ধর্মের এই কার্যকরী (ইউটিলিটেরিয়ান) দিকটা বাদ দেওয়া যায় না। ক্ষুধা দূর করতেই খাওয়া, রান্না করা : ভাল রসুইয়ে রান্নাকে

শিল্পকলায় তুলে দেন। পেট ও মন দুই তৃপ্ত। ব্যক্তিগতভাবে সাইকো-সোমাটিক, সমষ্টিগতভাবে সাইকো সোসিয়াল।

এই সাধনেও আমরা দেখবো দেহের জন্য প্রাণায়াম, কুম্ভক, মনের জন্য নাম।

বলাবাহুল্য আলোচনায় 'বিশ্বাস' স্থান পায়নি। বিশ্বাস নিয়ে তর্ক হয় না, ব্যক্তিগতভাবে আমি ঈশ্বর, জন্মান্তর, অর্থাৎ মন্দিরে বর্ণিত সকল কিছুই বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করতে হয়েছে। প্রথমে জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি এবং মন্দির পড়ে আমার বিশ্বাস পাকা হয়েছে।

শুধু ব্যক্তিসত্ত্বার উপরই প্রশ্ন নয়। এছাড়া আরও সব মনঃকষ্ট। যেমন—

'সাজায়ে স্বার্থের ঢোল, তুলিয়াছে মহারোল
গরজনে গগন বিভোর।
কে তোমরা চারিদিকে মোর।'

* * *

কি জানি কিসের তরে পরান আকুল করে
জানি না কোথায় ছুটে যাই
শুনিলে আনন্দ গাথা, প্রাণে কেন বাজে ব্যথা
সুখ মাঝে দুঃখ জাগে ভাই।

এ ছাড়া সাংসারিক ক্ষুদ্রতাও দুঃখ দেয়। স্বভাবতঃ মানুষ একা থাকতে চায়। জাগতিক রিপু করা ভালবাসায় আর মন মানে না। মন বিবাগী হয়ে নির্জন বনে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় চায়। নিরজন বন মাঝে, তাই আসিয়াছি ছুটে / হেথায় বাঁধিব ঘর গহনের হেম-কূটে। সংসারে আর কাজ নাই।

কিন্তু এতেও সুখ কোথায়? এ যে পলায়নি মনোভাব। এস কেপিসম। চলবে না। তোমায় বলেছি পলাতক, ব'লে হেসেছি

কত। যদি কেহ পথ দেখাও তবে সেই পথে চলতাম। জগতের কাজ, দেশের কাজ করতাম। জগতের দুঃখ অবসানের জন্য প্রাণ-মন ঢেলে দিতাম। নবীন উদ্যমে মোরে দাও মাতাইয়া, ডেকে লও তব প্রিয় কাজে।

আশীর্বাদ কর প্রভু, আমি দীন-হীন
চরিত্র পবিত্র যেন রহে চিরদিন।
বাহু হোক্ বজ্র-সম, অন্যায়-শোধনে,
প্রাণ হোক্ পুষ্প-সম দুখীর রোদনে।

মন্দির পথে

বৃক্ষস্থ সেবা

জড়ত্বের শেষ হয়েছে। দ্বিপদ জীব এখন মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে চলছে। সেবায়, ব্যক্তিসত্ত্বা সামাজিক সত্ত্বায় লীন হবে।

ওই যে কাঁদিছে কাঙাল-আতুর
বেদনার ধারা চক্ষে ;
আর কতকাল রহিবে ঘুমায়ে
লালসা-লালিত কক্ষে ?

কর্ম ও সেবার আহ্বান এসেছে। সেবা করতে গিয়ে উপলব্ধি হল উপর থেকে সেবা হয় না। খেটে-খাওয়া জনসাধারণের সেবা করতে হলে তাদের একজন হতে ববে। এ বিশ্বভুবনে সবার চরণে যেদিন এ শির লুটবে, সেই দিন তব মন্দির যেতে পথের খবর মিলবে। কোন মন্দির—যে মন্দিরের শোষণ নাই। না আছে শোষণের বা রণরক্ত সফলতার ইতিহাস।

ব্যবহারিক জীবনে অনেকেই এই সেবা ধর্মে বাঁধা পড়েন। সদগুরু সাধনেও সত্যে পৌঁছতে তিন জন্ম লাগতে পারে। অনেক মহাজন জগতের সম্পূর্ণ রূপ দেখতে পান। খণ্ডসত্য অতিক্রম করে পূর্ণ সত্যের সন্ধানে ফেরেন। বন দেখতে গিয়ে গাছ দেখে চলে আসেন না, বা গুনতে বসেন না। গোটা বনটাই দেখতে পান। জীবে দয়া (সেবা ?) করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর, ইত্যাদি খণ্ড সত্য। প্রেমভক্তির উপযুক্ত আধার খণ্ডসত্যে আবদ্ধ থাকে না। থাকতে পারে না (লোকশিক্ষার জন্যে চালিয়ে যেতে

পারেন)। সেবাকর্মে আধারটি সাধন গ্রহণ উপযুক্ত হয়। শুধু দিব্য দীপক প্রয়োজন হয়। তাঁর মনে প্রার্থনা জাগে—

নিরানন্দ জীর্ণ-জরা এ মন্দির হইতে
যাও নিয়ে যাও মোরে পূর্ণবিশ্বাতীতে
তোমার মন্দির দ্বারে।

মন্দির তোরণে

জীবন্ত-সঙ্গ

সময়ে ফুল ফোটে! জ্ঞান উন্মেষ, প্রশ্ন, নিঃসঙ্গ বাস, কর্ম ও সেবায় ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। জীবনে তবুও অশান্তি। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কিছু, অন্য কোন স্থানে। নদী যেমন বেগে সাগরে যায়— ব্যপ্ত নীল জলরাশির মধ্যেই তার শান্তি, সব বাসনা, সকল চঞ্চলতার অবসান। সমুদ্রও যেন নদীধারা বুকে নেবার জন্যই তৈরী হয়ে বসে আছে। ক্ষেত্র—তৈরী মানুষও সেই পরম ধন পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কোথায় কার কাছে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে একটা আবছা ধারণাও তার আছে। দিব্যধামে যাওয়ার জন্য তার দরকার পাসপোর্ট আর শক্তি। সশক্তি-নাম সেই বস্তু। নামই ওপেন-সিসেম যাতে দিব্যমন্দিরের দ্বার খুলে যায়। কে আছ প্রহরী—খোল খোল দ্বার। মন্দিরের দ্বারীও যেন দ্বার খোলার জন্য, নূতন দিগন্তে যাবার টেক্‌নিক্ আর 'নো হাউ' বলে দেবার জন্যই বসে আছে।

সারা দেহে তব রাজার চিহ্ন,
দুয়ারীর বেশে কিসের জন্য ?
সহিয়া অশেষ দুঃখ-দৈন্য
ডাকিতেছ সকাতরে ;
যাত্রিক যত মন্দির ঘিরে,
সকলের বোঝা লয়ে নিজ শিরে,
দুয়ার খুলিয়া দিতেছ হে ধীরে,
করুণায় আঁখি ঝরে।

এই দুয়ারী যাকে দুয়ারীর মত ঠিক লাগছে না—যে মন্দির দ্বার খুলে দেয়, বলে দেয় নিয়ম কানুন, সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে যে তাপিত জীবনে শান্তিজল সিঞ্চন করে, সে কেমন—

পূর্ণ-রাগের স্বর্ণাভ জটা
সুশোভিত শিরসিতে !
গণ্ড-বহিত করুণার ধারা
অখণ্ড লোক হিতে।

ললাট-দীপ্ত মোক্ষ-তিলক,
বক্ষে তত্ত্ব-মালা ;
হাতে করঙ্গ—প্রেমের ভাণ্ড,
দণ্ড—পারের ভেলা।

* * *

সত্য তোমার সরস স্বরূপ,
সত্য-সাধনা মাখা ;
সত্যে স্থিতি, চির পরিণতি,
সত্যের শুভ রাকা।

তুমি যে জন্মজন্মান্তরের বান্ধব। জীবন মরণের সাথী। তুমি আমাতে শক্তি-সঞ্চার কর। আমাকে দীক্ষা দাও।

হে পুরুষ, এ কি বীজ করিলে বপন !
নিমেষে বন্ধন টুটি'
অন্তরে উঠিল ফুটি,
অনন্তের অন্তহীন বীণার স্বপন।

* * *

বাসনার কশাঘাতে,
দুরাশার ঘূর্ণিবাতে,

কতই কেঁদেছি আমি স্মরি ভগবান্ ;
কভু বলিয়াছি মাতা,
কভু পিতা, কভু ভ্রাতা,
কভু স্বামী, কভু ত্রাতা, না পেয়ে সন্ধান

লয়-হারা ছন্দ-হরা
সন্দেহ বেদনা-ভরা
দীর্ঘদিন কাটিয়াছে গহন আঁধারে ;
আজি কি অপূর্ব সেধে
দিলে মোর বীণা বেঁধে,
সহজ সরল সুরে,—জ্যোতিমাখা তারে।

যে নামের সুধা তানে,
সন্ধান-বন্দনা-গানে,
যুগ-যুগান্তের আশা মিটিবে আমার,—
অমৃতের ধারা-যুত
ত্রিদিবের মন্ত্র-পূত,
সে মধু-নিষ্যন্দী নাম করিলে সঞ্চার !

ধন্য দাতা ধন্য দাতা,
ধন্য দীনজন-ত্রাতা,
মম দৈন্য-দুখ ধন্য তোমার কৃপায় ;
তব শক্তি সঞ্চরণে,
চিত্ত আজি মত্ত রণে,
ভাঙিয়া অনন্ত-নিদ্রা কুণ্ডলিনী চায়।

এখানে সদগুরু সাধন এবং নাম সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বাংলা দেশে সদগুরু সাধনের প্রবর্তক, স্বয়ং সদগুরু এবং সদগুরু অবতার শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তার কথাতেই বলি—

সদগুরুর নিকট দীক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। এখানে কোন কালাকাল, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই। তাহা সম্পূর্ণ কৃপা সাপেক্ষ। এ দীক্ষা যে কোন অবস্থায়, যথায় তথায়, একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই হয়ে থাকে। ভগবানের পদাশ্রিত ভগবজ্জন মহাপুরুষেরাই সদগুরু। সদগুরু শিষ্য করেন না, তিনি গুরু করেন। শিষ্যের ভিতর আপন ইষ্টদেবতা প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরই পূজা করেন। শিষ্যের দেহ তাঁহার দেব মন্দির। কোন প্রকার অপচার হলে, সেবক যেমন তাহা দেখে লজ্জিত হন, শিষ্যের কোন দুর্দশা দেখলে ওই গুরু তেমনই নিজের সেবা-পূজার ত্রুটি হয়েছে মনে করে মলিন হয়ে যান।

সদগুরু প্রদত্ত নাম, নাম নয়, অক্ষর নয় বা একটা শব্দ নয়, এই নামেই ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের ভিতরে এই শক্তি-সঞ্চারই সদগুরু দীক্ষা। এই শক্তি ভগবানের কৃপায় একবার কারও লাভ হলে তার আর নিজের কিছুই করার থাকে না। তাঁর জীবনের সমস্ত কার্য এমন-কি প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত, সেই একজনার ইচ্ছাধীন। কুমীর-পোকার আরশোলা ধরার মত সদগুরু শক্তি সঞ্চার করে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে ক্রমে আত্মসাৎ করে নেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে—'দীক্ষা গ্রহণ মাত্রেন নরো নারায়ণ ভবেৎ'।

সদগুরু আশ্রয় যারা পেয়েছেন তারাই নিরাপদ হয়েছেন। সদগুরুর আশ্রয় পেলে কোন ভয়ই থাকে না।

সদগুরু লাভ কি এতই সহজ। বহুজন্ম সিদ্ধি লাভ [illegible]

একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই সদগুরু লাভ হয়। সদগুরু লাভ হলে তারা আর কোন অবস্থাতেই পতিত হন না।

দীনের কুটিরে ভাই, পেয়েছি সে ধন।

কত যুগ-যুগান্তরে,
কেঁদেছি যে ধন তরে,
উদাসী সর্বস্ব-ত্যাগী যাহার কারণ ;
যার তরে ভস্ম মেখে,
দীর্ঘ জটা শিরে রেখে,
কত জন্ম কাটাইনু খুঁজি ত্রিভুবন ;

কম্বল সম্বল করি,
সুখ-আশা পরিহরি,
শ্মশানে-মশানে কত করিনু ভ্রমণ ;
বাসন্ত-কুসুম ভরা,
ত্রিজগৎ আলো-করা
শোক-পাপ-তাপ-হরা কনক-রতন—
প্রাণের পবিত্রতম পেয়েছি সে ধন।

গোঁসাইজী বলেন মহাদেব এ সাধনের প্রবর্তক নন। তিনিও এই সাধন করে সিদ্ধ হন। বেদে এই সাধনের বিষয় উল্লেখ আছে, এ সাধন আধুনিক নয়, ইহা বহু প্রাচীন বৈদিক সাধন। প্রথমে মহাদেব, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি যোগীশ্বরেরা এই সাধন করে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

আমাদের এই সাধন, পূর্বে আর কখনো গৃহস্থদের মধ্যে ছিল না, গৃহস্থদের এ সাধন লাভ করা এই প্রথম।

তোমরা কি সাধারণ। যিনি তোমাদের লক্ষ্য, তাঁর চারিদিকে কত যোগী, কত ঋষি, কত দেব-দেবী, কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু, কত শিব রয়েছেন। সেই অনন্ত উন্নতির পথে কোটি কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, কোটি কোটি বৈকুণ্ঠাদি লোক বিন্দু হইতেও বিন্দু—কিছুই নয়। আমরা যাকে চাই কোটি কোটি অবতার, কোটি কোটি ভক্ত ও পার্ষদগণ তাঁর চতুর্দিকে ঘুরছেন। সেই অন্তহীন মহান পুরাণ-পুরুষই আমাদের লক্ষ্য। অবিরাম সেই দিকেই আমরা চলবো। সর্বত্রই আমরা আনন্দ করবো, কোথাও দাঁড়াব না। বদ্ধ কোথাও হব না।

সর্বদাই নাম করতে থাক। ভাব, লীলা প্রভৃতি সমস্তই খুলে যাবে। তখন চৈতন্য কে, খৃষ্ট কে, লীলা কি আপনা-আপনিই প্রকাশ পাবে। এ সাধন করতে করতে ধীরে ধীরে পাঁচটি অবস্থা লাভ হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

নিরাশার নিশোয়াসে হতাশ যে জন,
করিলে তাহার প্রাণে আশার সঞ্চার
অযাচকে যেচে দিলে রাতুল চরণ,
প্রহরীর সাজে তুমি প্রভু হে আমার।

ক্লান্তিহরা শান্তিপুরে সুরধুনী-তীরে,
জন্ম তব দ্বন্দ্বাতীত অদ্বৈত মন্দিরে।

মন্দির-প্রাঙ্গণে

মনুষ্যত্ব—অনুষ্ঠান

সদগুরু কৃপা করেন, কিন্তু অপাত্রে কৃপা করেন না। দেয় দ্রব্যের মূল্য বোঝা চাই। তা না হলে অরসিকেষু রহস্য নিবেদনের মতো—তা হবে পণ্ডশ্রম। বিধি নিষেধ মানতে হবে, দেহটিকে তৈরী করতে হবে।

সত্য-বচন সত্য-করম সত্য-সাধন রথে,
সত্য-শাসন মস্তকে বহি চলিব সত্য-পথে।

* * *

অন্তরে মম অযুত-দ্রোহী, নেশায় জীবন ভোর,
দ্রাক্ষা-ক্ষরিত গরল সেবনে কি বা প্রয়োজন মোর!
হিংসা-দ্বন্দ্ব-কুহক-ছন্দে প্রাণে চির হাহাকার,
নিত্য-ভোজনে প্রাণীর হিংসা করিব না কভু আর!
অন্ন-ব্রহ্ম তোমার চিহ্ন, রবে সদা সুপাবিত,
পরশিতে কভু দিব না কাহারে, ত্যজিব পর্যুষিত।
এ-তিন তোমার নিষেধ আজ্ঞা, রহে যেন প্রাণে লেখা।
এ-তিন শাসনে বন্ধন খসি নন্দন দিবে দেখা।

* * *

প্রভাতে উঠিয়া ভূতলে লুটিয়া
হইব দণ্ডবৎ;
স্নান সমাপনে বসি নিরজনে
হইব দণ্ডবৎ।

দু'বেলা আসনে বসা চাই। নিত্য নিয়মিত সাধনে অনেক

দুর্ভোগ কাটে। সাধনে, নামে রুচি জন্মে। নাম নামী নাম দাতার প্রভেদ ঘুচে যায়। তখন গুরু ভক্তি জন্মে। তা না হলে গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান—সে কি সহজ কথা। গোঁসাইজী বলেন—অগ্নি তো সকল স্থানেই আছেন, কিন্তু সেই অগ্নিকে কি কেউ ধরতে পারেন, না তাহা দ্বারা কোন কাজ হয়। আগুনের আবশ্যক হলে সর্বত্র যে আগুন আছে, শূন্যে যে আগুন রয়েছে তা হতে কেউ তা নিতে পারে না : প্রদীপ, ধুনি, চুল্লী ইত্যাদি যে সকল স্থানে ঐ অগ্নি জ্বলন্ত ভাবে বিশেষ রূপে রয়েছে, সেইখানেই যেয়ে আগুন নিয়ে থাকে। সে রকম ঈশ্বর সর্বব্যাপী হলেও কেউই তাকে ধরতে পারে না। গুরুতে ঈশ্বরের চিৎ শক্তির প্রকাশ দেখে তথায় পূজা করতে হয়। গুরু তো আর মানুষ নন্। গুরুই ভগবান, গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পূজা।

আমি তোমারে লইয়া রহিব।

আর যত সব বৃথা কলবর,
নীরবে সে সব সহিব।

সার বস্তুর আস্বাদনে অসার-সংসার ক্রমশই তিক্ত মনে হয়। ভোগের জড়তা মাঝে ত্যাগ জেগে উঠে / আজি যে শুনিতে পাই সুখে কভু সুখ নাই, / সব ভস্ম সব ছাই জীবন সম্পুটে।

সাধনে জ্বালাও আসে। ভীষণ শুষ্কতা। যার জন্য গোঁসাইজীকে জ্বালামুখী যেতে হয়েছিল। একে গোঁসাই বলেছেন সংগ্রাম। এ সংগ্রামে কখন বা সাধক পরাস্ত হন, আবার উঠে সংগ্রাম সুরু করেন।

এ কী জ্বালা ওগো, এ কী হাহাকার,
অত্যাচারের মূর্তি কাহার।
শুষ্ক ধারায় ব্যর্থ সাঁতার,
ব্যর্থ জীবন-মেলা ;

ব্যর্থ সাধনা ব্যর্থ বিকাশ,
ব্যর্থ নামের ব্যর্থ নিশাস,
কাজ নাই আর ব্যর্থ প্রয়াস,
সমাপন কর খেলা।

* * *

ধিকি ধিকি জ্বলে তুষের অনল,
ধূ ধূ ধূ ধূ মরু কোথা পাব জল,
তপ্ত এ বুক হইবে শীতল,
কোন্ তটিনীর নীরে?

চির-সুধামাখা এস গো মরণ
আজি হে তোমারে করিব বরণ,
কাতর চিত্তে যাচি গো চরণ,
দাঁড়ায়ে কঠিন তীরে।

সাধকের মনে তখন প্রবল সংশয় দেখা দেয়। অনেকে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন। তখন নাম ছাড়তে নেই। জপ নাম, জপ নাম।

ঘন-আঁধারে
তর-পাথারে
ধাঁধা মাঝারে
মধু নাম;
সুধা-মঙ্গল
পূত উজ্জ্বল
দীন-সম্বল
মধু নাম।

ভবে আসিয়া
ভাবে ভাসিয়া
মোহ নাশিয়া
মধু নাম ;
কাম-কাঞ্চনে
লাস-লাঞ্ছনে
সাধ বাঞ্ছনে
মধু নাম।

সকল কাজের মধ্যেই নামকে মিশাইয়া দাও।

চির জীবনে
চির মরণে
চির শরণে
মধু নাম।
চির আশ্বাসে
দৃঢ় বিশ্বাসে
প্রতি নিশ্বাসে
মধু নাম।

গোঁসাইজী লিখেছেন শ্বাসে প্রশ্বাসে এই নাম সাধনই যথার্থ সাধন। ইহাতে কামাদি সমস্ত রিপুর বিনাশ হইবে। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা আসিবে, বিশ্বাস পাইবে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে নানা প্রকার দর্শন হইয়া থাকে। ভগবান যে আমাদের অনেক দূরে আছেন তাহা নহে, তিনি সর্বদাই আমাদের কাছে বর্ত্তমান। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিতে পাপ রাশি জ্বলিয়া গেলে, তাঁহার দর্শন লাভ হয়।

দ্বারী গো, নহ তুমি কেবল দুয়ারী।
কি সন্ধ্যায় কি প্রভাতে
রহিয়াছ সাথে সাথে,
মন্দিরের পথে সহচরী।
নহ তুমি কেবল দুয়ারী।

* * *

কভু আলো কভু আঁধা
এ কি গো আঁখির ধাঁধাঁ,
শত দিকে শত বাধা
পথ নাহি পাই;
হেন বিপদের ক্ষণে,
হাত ধরে সযতনে,
কে তুমি কহিছ চুপে,
'কোন ভয় নাই!'

সদগুরু শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। জন্ম না নিয়েও কত রকমে, কত উপায়ে শিষ্যকে কৃপা করেন। বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য ইত্যাদির ভিতর দিয়া, নানা বিষয়ের ভিতর দিয়া, সদগুরু কৃপা করেন।—গোঁসাইজী।

তোমার করুণা আমারে জড়ায়ে
গাহে আজি এ কি রাগিনী!

গুরু কৃপা এবং সাধনে এ সময়ে সাধকের একে একে পঞ্চ কোষ ভেদ হইতে থাকে।

আর তো যাব না সে বিষের ঘরে
বড় দাগা পেয়ে এসেছি হেথায়,
ভুলের মাঝারে লুকায়ে বিবরে
আর ভুলিব না ভুলের কথায়।

(অন্নময়কোষ ভেদ হইলে পার্থিব বস্তুতে আকর্ষণ থাকে না —গোঁসাই।)

রিপুর অত্যাচার তখনো আছে। আবার, অন্ধকার সাধক মনে ভীতির সঞ্চার করে।—

কামনার কল-কল্লোল-ধারা,
গলিত চিত্তে বন্ধন-হারা,
মদির-মত্ত সুপ্ত কাহারা
তাণ্ডব-নটে নাচে ?

*　　　*　　　*

মায়ার দারুণ রৌরব-শ্বাস,
মেখেছে দয়ার কুঙ্কুম-বাস,
উজলের সাজে সেজেছে বিলাস,
পিশাচ—দেবতা-রূপে ;
বিনয়-গর্বে চিত্ত আমার,
কেবলি রচিছে চির হাহাকার,
আপন বঞ্চি বিপনি তাহার
সঞ্চিত কাম-কূপে।

আবার সাধন, আবার প্রার্থনা—নাম। এস তুমি, এস প্রভু, রিপুর শাসনে, দীপ্ত কর প্রাণ মোর তোমার ছটায়। এবার হবে প্রাণময় কোষ ভেদ। 'প্রাণময় কোষ ভেদে শারীরিক উত্তেজনা থাকে না।'—গোঁসাই।

সখা, অপরূপ তব রাগিনী !
গুঞ্জনে মম চিত্ত-কাননে
মুগ্ধা যতেক নাগিনী।
কাম নিবাইয়া কামনার লেখা,
প্রেম-জ্যোতি-রূপে দিয়াছে হে দেখা,

বাসনা-অগ্নি সাগ্নিক সাজে
আহুতি দিয়াছে ধমনী ;

হৃদয়ের যত ক্রোধ-দীপরাগ,
ফুটিয়া উঠেছে হয়ে অনুরাগ,
মাখিয়া তোমার পরশ-পরাগ,
সোহাগ-সমীরে দোলনী।

একে একে লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের রূপান্তর হল, এককথায়—

ছিল যত বৃথা ব্যাকুল দ্বন্দ্ব,
সকলের মুখ হয়ে বন্ধ,
পাইয়া তোমার প্রেমের গন্ধ
নন্দন হল মেদিনী ;
গুঞ্জনে মম চিত্ত-কাননে
মুগ্ধা যতেক নাগিনী।

নামেই সব হচ্ছে। আশা হতাশায়, দুঃখ বেদনায়, রিপুর অত্যাচারে, সকল রকম বিপর্যয়ে নাম-ই একমাত্র প্যানাসিয়া। নামে তখন রুচি হওয়া স্বাভাবিক। দিবস রজনী কর হরিনাম গান/নাম-ই নিখিল বিশ্বে সুখের নিদান। নাম নামী নামদাতা এ তিন অভেদ এ বিশ্বাসও হ'ল।

আদৌশ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থ নিবৃত্তি স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

দেবত্ব—ব্রহ্ম-জ্ঞান

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পুনস্তু পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি পূর্ণরূপে অবস্থান করছেন। ব্রহ্ম পূর্ণ, কার্যাত্মক ব্রহ্মাও পূর্ণ। পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে এই জগতের প্রকাশ হইয়াছে। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগত সেই পূর্ণব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, কেবল পূর্ণব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকে।—গোঁসাইজী।

কলিকলুষনাশনম্ এবং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপনম্, (যার যেই নামে দুঃখ পাপতাপ হরে/সেই তার হরিনাম বাহিরে অন্তরে,) নাম, মনের ময়লা দূর করে এবং জাগতিক জ্বালা যন্ত্রণা উপশম করে। সাধককে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করে তোলে। পঞ্চকোষে ঢাকা জীবাত্মা পরমাত্মার সন্ধান পায়। গোঁসাইজী বলেছেন, অন্নময় কোষ ভেদ হইলে পার্থিব বস্তুতে আকর্ষণ থাকে না, প্রাণময় কোষ ভেদে শারীরিক উত্তেজনা থাকে না। মনোময় কোষ ভেদে সঙ্কল্প বিকল্প যায়, বিজ্ঞানময় কোষ ভেদে সংশয় বুদ্ধি থাকে না, আর আনন্দময় কোষ ভেদে পার্থিব আনন্দে মুগ্ধ করতে পারে না।

বাঞ্ছা-কল্প মোহ-বিকল্প
সব হিন্দোলে আজ
মনোময় ভেদী মনন-বর্মে
সাজাও মহান সাজ।
সংশয়-মেঘ ধ্বংস করিয়া
বিজ্ঞানময় ব্যোমে.

তোমার সত্ত্বা উঠুক ফুটিয়া
কিরণ-ক্ষরিত সোমে।

বিজ্ঞানময় কোষ ভেদের পর আর কোন সংশয় রইল না। সব কিছুতেই তখন ভগবৎ জ্ঞান।

আমি যখন যেদিকে চাই,
তব বিভূতি হেরিতে পাই—পাই—
পাই গো পাই।

তখন সুখে দুঃখে, ছোট বড় সকলের মধ্যে, নিজ তনু-মন-জীবনে সত্যের জয়ে, সকল কিছুর মধ্যেই সেই বিভূতি দেখা যায়। এই দিব্য অনুভূতি ক্রমে সত্ত্বা জ্ঞানে পরিণত হয়। ভালোতে মন্দতে, জীবনে-মরণে, আশীর্বাদ-অভিশাপে, স্বর্গ-নরকে সমানভাবে দিব্য-সত্ত্বা জ্ঞান হয়। তখন পুরণ-মূল্যবোধের আর তাৎপর্য থাকে না। পার্থিব সুখ-দুঃখ আসলে আমাদের সংস্কার বা মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। ব্রহ্মজ্ঞানে মানুষ সেই সংস্কার মুক্ত হয়। নূতন আনন্দের সন্ধান পায়—যার উল্টোটাও দুঃখ নয়। এদিকে-ওদিকে দু'দিকে আনন্দ।

যত স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ ঐক্য নাশিয়া
এল চির গুপ্ত এ কী দীপ্ত হাসিয়া
আজি ভাল মন্দ সব দ্বন্দ্ব ঘুচিল
আজি মম মৃত্যু চির সত্যে বাঁচিল।

তবুও আমি এ আনন্দ চাইছি না। যে আনন্দ যে ভোগ দিয়েছ, আর তাহে নাহি সাধ। তোমাকে তো পুরোপুরি জানা হয়নি। দীপ্ত রসে ব্যক্ত কর রূপের ঠিকানা।

আমিত্ব বোধ থাকলে আর বোধ হয় এগোন যাবে না। তুমি গো তুমি। আমিত্ব বোঝা না পারি বিকাতে তাই এসেছি হে

তোমাতে লুকাতে। আমার সাধন ভজন, যোগ, প্রার্থনা উপাসনা কিছুই নয়। তুমিই সব, আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা।

তুমি বিশ্ব ব্যাপিয়া রয়েছ। সুন্দর তুমি, রাগরূপরসকন্দ। তোমার ব্রাহ্মী বরণ রূপ দেখবার জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল। কিন্তু আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখ যেন কেউ ঢেকে রেখেছে। অন্ধ আমি গো অন্ধ। তুমি দেখা দাও তোমার নিত্যস্বরূপ উদ্‌ভাসিত কর।

তখন আত্মদর্শন। নিজের মধ্যেই চিরসুন্দরকে ভক্ত দেখতে পায়। এই কি গো আমি আমার স্বরূপে এত অপরূপ ঘটা।

আজ সুন্দর আমি, সুন্দর সুরে
গাব সুন্দর গান
চির সুন্দর পদে সুন্দর সাজে
দিব সুন্দর প্রাণ।

এ কি শ্রীরামকৃষ্ণের পাকা আমি? ভক্ত তখন আহ্বান জানায় তুমি এস, এস তাড়িত জড়িত চরণে, এস উজল উছল বরণে, এস নিদ্রায় জাগি স্বপনে, এস জাগ্রতে চুমি গোপনে। জীবনে এস মরণেও এস। তুমি এস।

এই সময় ভগবৎধ্যানে স্থিরচিত্ত সাধক সমাধিমগ্ন হন।

কমল-হস্ত বুলাইয়া গায়,
মধুর কণ্ঠে ডাকিলে আমায়,
আধ ঘুম-ঘোরে বন্ধু, তোমায়
বক্ষে লইনু টানি;
স্বপন-জড়িত মুদিত নয়নে
কে এলো কিছু না-জানি।

মনে অসীমত্ব বোধ জেগেছে এবার। এবার নিজ দৈহিক সীমা-বদ্ধতা, সমাধির জন্যও সে আর ব্যগ্র নয়। কতকাল আর ঘরের

মধ্যে অজানা জ্যোতির ধ্যান করে কাটাবে। বিশ্বপ্রকৃতিতেই বিশ্বরূপ দর্শন কর—

চেয়ে দেখ কুটিরের চারিপাশ দিয়া,
উজল উছল জ্যোতি পড়িছে ঝরিয়া
রজত-নিঝর-রূপে।

সাধকের কাছে এমন নাম সর্বভূতে, করুণা সর্বভূতে।—

বৃক্ষে বৃক্ষে শুভ নিক্কণ, পক্ষীরা গান গাহিছে,
তোমার সৌখ্যে দ্রাক্ষালতার সরস বক্ষ মোহিছে।
মানস-মদির-মাধুরী-মগনা-মত্ত মেদিনী মথিয়া,
তোমার চরণে চুম্বন ফুটে, সারা তনু-মন ব্যথিয়া।

মায়াবাদীরা বলে ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা। চেতনাস্বরূপ ব্রহ্ম এক শক্তি। তিনি নিরাকার। জগত সংসার, নদীনির্ঝর, ক্যামেলিয়া কৃষ্ণচূড়া, নন্তু দুলাল রেবা বেলা, আরতি অণিমা অণিমার স্বামী, আমরা, সব মায়া। তুমিও। আমি তুমি ভগবান ইত্যাদি এ্যানথ্রপো-মরফিক। মানুষ মনুষ্যভাবে ভেবে এই সব খাড়া করেছে। জীব মায়াবদ্ধ থেকো না। জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তা কর। এই অদ্বৈতবাদ।

ভক্ত যে, তার মন মানে না। আমায় রসে বশে রাখিস—শুষ্ক সন্ন্যেসী করিস নে মা। ভক্ত ভগবানকে দেখতে পায়।

এই যে তোমার ধরণী বিপুল,
সবে কহে এটা একেবারে ভুল,
তবে কারিকরী অপার অতুল
কেবল ভুলের বশে;
রবি নহে রবি—চাঁদ নহে চাঁদ,
সব নাকি শুধু ভুল-পাতা ফাঁদ

তোমার বিধান যত ছিরি-চাঁদ
স্বপনের প্রায় খসে।

তাই বুঝি এই ভুলের মাঝারে,
ভুল হতে সখা, বাঁচালে আমারে,
তব মণিময় মন্দির দ্বারে
টানিয়া এনেছ হেসে;
এ বিশাল হাটে ভুল মাঝে পশি
পাছে আমি কোনো ভুল করে বসি,
সত্য-স্বরূপ তাই পরকাশি
ভুলেরে ভুলালে এসে।

অদ্বৈতবাদ এবং পরমেশ্বর সাকার কি নিরাকার সম্বন্ধে গোঁসাইজী বলেছেন—

শাস্ত্রে আছে তিনি নিরাকার আবার সাকার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না। পরব্রহ্ম স্বীয় শক্তি দ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্ট পদার্থ জড় ও চেতন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই সকল পদার্থ এবং তদ্‌যোগে যত কিছু পদার্থ হইয়াছে সমস্তই জড়। কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষী, মনুষ্য ইহারা চেতন। সৃষ্টিকর্তা এই উভয়বিধ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন —কর্তা নিজে স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত তাহার তুলনা হয় না। এ জন্য তিনি নিরাকার। নিরাকার বলিতে শূন্য নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ, তাঁহার রূপ আছে। সে রূপ নিত্যরূপ। সে রূপ সচ্চিদানন্দময়। জ্ঞানচক্ষু, ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে পরমেশ্বরের নিত্যরূপ দর্শন করা যায়। যতদিন তাহার নিত্যরূপ দর্শন না হয় ততদিন তাহাকে সাকার বা নিরাকার বলিয়া যাহাই বর্ণনা করিবে, তাহা তোমার কল্পনা অথবা শোনা কথা। চির[illegible]

ভগবানকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দভোগ করিয়া আসিতেছেন, সে রূপমাধুরী যে একবার দেখিয়াছে সে কি আর ভুলিতে পারে। দীনবন্ধু প্রভু হৃদয় উদ্যানে উপস্থিত হইলে, অহঙ্কার মালি দূরে গিয়া করজোড়ে অবস্থান করে। প্রভু আমি দাস—মালির মুখে কেবল এই কথা।

শঙ্করাচার্য প্রথমে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। পরে হালে পানি না পাইয়া যখন দ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন তখনই তাহার প্রাণ সরস হইল। আমাকেই কেন দেখ না। কালাপাহাড় তো হইয়াছিলাম। কেবল বলিতাম—ভাঙ্গরে ভাঙ্গরে, ঠাকুর দেবতা কিছুই নয়, কোন অবতার কিছুই নয়—কোন তীর্থ কিছু নয়। এখন দেখ দেখি, কি অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। দেখিতে পাইয়াছি ইহা সমস্তই সত্য। শুষ্কমতের উপর মানুষ কতদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?

শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে পাপরাশি জ্বলিয়া গেলে তাহার দর্শন লাভ হয়। তখন জীবাত্মা ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। মনুষ্য যতই কেন উন্নত হোক না, একেবারে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া যায় না। কেহ যদি সমুদ্রগর্ভে, সমুদ্র পরিমাপ করিবার জন্য ডুব দেয় এবং যদি তাহার পৃথকভাবে জ্ঞান থাকে তাহা হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা—মনুষ্য চিদানন্দ সাগরে ডুবলেও তাহার সেই প্রকার অবস্থা হয়। অন্য লোক মনে ভাবে যে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তখনো তাহার পার্থক্য বোধ থাকে। তখন সে ভগবানের রাসলীলা সর্বক্ষণ দেখিতে থাকে ও ধন্য হয়। যখন জীবাত্মা ব্রহ্মানন্দ লাভ করে তখন সে কখনও মধুর সাগরে কখনও বা চিনির সাগরে ডুবিয়া থাকে, ইহা কেবল কল্পনা মাত্র—কেননা সেই-আনন্দের তুলনা নাই। তখন জীবাত্মা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে। মনে হয় কেন এই আনন্দে থাকিলাম। মধুরং মধুরং মধুরং।

অদ্বৈতবাদ মত নহে, আত্মার একপ্রকার অবস্থা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইলে আত্মা আপনাকে ভুলিয়া যান। যাহা দেখেন ব্রহ্মসত্বাই দেখেন। অনন্ত সাগরে একটি জলকণা প্রবেশ করিলে সে চারিদিক হিল্লোল-কল্লোল দেখে। কখনও ভাসে, কখনও ডোবে। আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইহা না হইলে ঋষিগণ, মুনিগণ এত পরিশ্রম করিয়া সাধন করিবেন কেন? ইহাই পরম সম্পদ, ইহাই পরম গতি।

তুমি ময় এই শ্যাম ধরাখানি
ধরাময় তুমি—তুমি;
প্রতি পরমাণু কহে তব বাণী
তোমার চরণ চুমি।

এক স্যাম বহুধা ভবাবি (একোহং বহুস্যাম)। এক ছিলাম, বহু হব। পৃথিবীর সকল বস্তুতেই তিনি রয়েছেন। যদি ঈশ্বরকে শক্তি বলে বিশ্বাস করি, বস্তু বলে বিশ্বাস করতেই বা বাধা কোথায়? বর্তমান পদার্থ বিদ্যা মতে বস্তু (ম্যাটার) আর শক্তি (এনারজি) পরস্পরে বর্তায়। $E = MC^2$।

বিশ্বরূপী বিশ্বেশ্বর! তব পদে নতি
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তব প্রেম-মুখ-জ্যোতি!

ব্রহ্ম দর্শন

নমো নম পুরুষ-প্রধান !
নিখিল বিশ্বের আত্মা,
সর্বব্যাপী পরমাত্মা,
চির-দীপ্ত তব সত্তা
—অনন্ত মহান্।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারী,
দিব্য বিশ্বরূপ-ধারী,
ষড়ৈশ্বর্যময় হরি
পূর্ণ ভগবান ;
বসতি নিখিল বিশ্বে
বিশ্ব ফুটে তব আস্যে,
চির-ব্যাপ্ত বাসুদেব
চির-গরীয়ান

তুমি সৎ সত্যসন্ধ,
চিন্ময়-স্বরূপ-ছন্দ
একমাত্র অদ্বিতীয়
ব্রহ্ম-পরাৎপর
নরের অয়ন তুমি
সর্ব-পরিণতি-ভূমি
নমো ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী
শিব মহেশ্বর।

তব নিয়ন্ত্রিত তন্ত্রে,
প্রণবের মহামন্ত্রে,
এ কী নাদ বিশ্ব-যন্ত্রে
শাশ্বত সঙ্গীতে ;
অখণ্ড আরতি তব,
বিশ্ব-জোড়া অভিনব,
প্রতি পরমাণু চলে
তোমার ইঙ্গিতে।

অগ্নি তুমি, হোতা তুমি,
হবি ও আহুতি তুমি,
অনাদি-গন্তব্য-ভূমি
জয় তব জয় ;
যখন যেদিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
তুমি ছাড়া নাই ঠাঁই,
তুমি সর্বময়।

তুমি কর্তা, তুমি কর্ম,
তুমিই কারণ মর্ম,
নিরগুণ নিরাকার
অরূপে স্বরূপ
শাশ্বত তোমার ধৃতি,
নির্বিকল্প নিরাকৃতি,
তব পদে চির নতি
হে বিশ্বের ভূপ

ব্রহ্মদর্শনের পর চেতনা পেয়ে সাধক প্রথমেই তার এই দীর্ঘপথের একান্ত আপন জন, সেই সহযাত্রীর খোঁজ করে। পথের সাথী, তুমি যে আমাকে সঙ্গ দিয়েছ, দিয়েছ বরাভয়। তোমার জন্যই তো আমার নিরাপদভূমি লাভ। কোথায় গেলে। কিন্তু একি, বিশ্বজোড়া বিশ্বরূপ আজি তব হাস্যে কি হেতু বিকাশে? তুমি শুধু সাথীই নও বাপু। শুধু দ্বারীও নও। তোমার আমার যে যুগ যুগ পরিচয়। মাঝের কয়েকটা দিনই যা তোমাকে ভুলে ছিলাম।

আজি কোন্ মহা শুভক্ষণে
এলে তুমি আলো বিথারিয়া,
কি জানি কি অবিরাম স্রোতে
প্রাণ মোর চলিল ভাসিয়া।

মন্দিরে

ব্রহ্মত্ব—যোগ

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
—শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধিমার্গ ভজন করিয়া
বৈকুণ্ঠে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাইয়া,
সার্ষ্টি, সারূপ্যে আর সামীপ্য সালোক্য
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শাস্ত্রানুগ ভজনে সাধক সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি পেতে পারে। সাযুজ্য বা ব্রহ্মযুক্ত হতে ভক্ত চায় না—সাধারণত এই মতই পণ্ডিতেরা পোষণ করেন। প্রচলিত গুরুবাদ বা গুরুতত্ত্ব থেকে সদগুরুতত্ত্ব একটু আলাদা। এখানে নাম, নামী, নামদাতা একই। গুরু সাধকের সাথে সাথেই আছেন। এখানে চতুর্বিধ মুক্তি তো আছেই—সাযুজ্যও আছে। সেই অদ্বৈতাবস্থা থেকে সাধক আবার দ্বৈতাবস্থায় ফিরে আসেন। একে দুই হয়ে পরস্পরের সুখের কারণ হন। ভেদ আবার অভেদ।

এখানে বলা দরকার যে মহাপ্রভুর সময়ে এই সদগুরু সাধন একজন মহিলা ও তিনজন সাধক পেয়েছিলেন। সাড়ে তিনজন বলা হয়েছে। 'তারা শুধু শিষ্যই নহেন, তিনি তাহাদিগকে অন্তরঙ্গ

সাধন শিক্ষা দিতেন। এবং সাধারণ হইতে কিছু অন্তভাবে সাধন প্রণালী শিখাইয়াছিলেন'।—গোঁসাইজী।

রামানন্দ স্বরূপোঽপ্যথ কিল শিখিমাহাতী
স্তৎ স্বসা সা
বিখ্যাতা মাধবীতি ত্রয় ইহ পুরুষাঃ
স্ত্রী চ সৈকাহিতেভ্যঃ।
শ্রীগৌরাঙ্গ স কিঞ্চৎ পরমিতিশুভদাং
যাং স্ব শক্তিং দদৌ যাং
নান্যেপ্রাপুর্যদাসন্ পৃথগিহ বহুধা
স্ব'স্ব কর্মানিতেষাম॥

শ্রীস্বরূপ রামানন্দ শ্রীশিখিমাহাতী।
তার ভগ্নী মাধবী এ সাড়ে তিন রতি॥
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় মাত্র এহি চারিজনে
স্বকীয় শকতি শুভ দিলেন গোপনে॥
জগতহিতার্থে কর্ম করাবার লাগি
আন ভক্তগণে ইহা কেহ নৈল ভাগি॥
—শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত।

'সাযুজ্য না লয় ভক্ত ব্রহ্ম যাতে ঐক্য'—সদগুরু সাধনের কথা নয়। এখানে অচিন্ত্যভেদাভেদ।

কনক তোরণে সেজেছিলে দ্বারী,
প্রাঙ্গণে ছিলে সঙ্গী আমারি,
আজি এ মানস-মন্দিরে হেরি
অপরূপ কলেবর;
হে দ্বারী, হে সাথী, হে আমার রাকা,
উজল শোভায় কি সুষমা আঁকা।

এ কি অপরূপ হে অরূপ-মাখা
মধুর মাধুরী-থর।
বিকচ নবীন ব্রহ্ম-কান্তি,
দিক-দিগন্ত লোকিত ক্ষান্তি,
অন্তরে চির চরম শান্তি,
পরম প্রাণেশ্বর।

সাধকের তখন সব কিছুতে ইষ্টজ্ঞান—ইষ্টস্ফুর্তি। সকলই মধুময়, রসময়। নাম নামী নাম দাতার অভিন্নতাও উপলব্ধি করেছে। জয় নাম জয় নামী জয় নাম দাতা / পরম করুণালয় শরণৈক ত্রাতা। চতুর্বিধ মুক্তি ও তার করায়ত্ত।

সাষ্টি´ঃ—

হে মোর জীবনাধিক প্রিয়,
হে মহান্ রাজ-রাজেশ্বর!
ঋদ্ধি-সিদ্ধি-মণ্ডিত শোভায়
এ কী সাজে সাজাইলে ঘর?
* * *
অফুরন্ত কুবের-ভাণ্ডার,
দিলে তার দ্বার উঘারিয়া,
থমকি' চমকি' আমি দীন
রহিলাম বিস্ময়ে চাহিয়া।

ঐশ্বর্যে সাধক বাঁধা পড়েন না। তাঁর ঐশ্বর্য চাই না। কেবল তোমারে আমি চাই, তুমি মোর সকলের সার। এর পর মিলন ও যোগসাধন। বাহিরবিশ্বের কিছুতেই আর মন ভরে না। যদিও বিশ্বরূপে বিশ্বেশ্বর।

করে সকল দুয়ার বন্ধ
ঢাক বাহিরের রস গন্ধ :

তোমায় আমায়
এস দু'জনায়
থাকি আনন্দে ঘুমিয়া,
তব সুচারু চরণ চুমিয়া।

এস দক্ষিণে বামে ধাঁধি
এস পুরব পশ্চিমে বাঁধি
অধ ও উর্ধ্ব
কর হে রুদ্ধ
ক্ষুদ্র আমারে মথিয়া,
এস সকল দুয়ার রুধিয়া।

সালোক্য :—

তব সাথে পরানে পরানে
এক তারে বীণাটি জড়িত,
বাজে এক সুমঙ্গল রাগ,
নিশীথের ঝিল্লি-মুখরিত।

এক রবি কিরণ ছড়ায়,
এক শশী হাসে তারাদলে,
এক পুত মন্দাকিনী-ধারা
নব-রাগে পুলকে উছলে।

কিন্তু—

এক ঘরে বসতি করিয়া
এ কেমন হারাই হারাই!
কেন হে বিচ্ছেদ দেয় দেখা,
অনুক্ষণ হেরিতে না পাই?

আমার যে সব সময় দেখার বাসনা। তুমি আমার নয়নতারা হও। বল বধু কি করিলে তোমা' চিরদিন পাইব দেখিতে।

সারূপ্য ঃ—

ভগবানের রূপ পাওয়া নয়। সকল রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখা। দরবেশজী অতি সুন্দরভাবে সারূপ্য বর্ণনা করেছেন। বলেছেন—তুমি এত সুন্দর যে তুমিই তোমার তুলনা। আবার আমি সকল কিছুই তুমিময় দেখি। অণুপরমাণুর ভিতরও তুমি। তুমিই—

পাপরূপে কালো হয়ে এসে
পুণ্যরূপে আলো দিয়ে যাও,
তাপরূপে মরুভূমি সৃজি'
স্নিগ্ধতার সলিলে ডুবাও।

আমার এই যে দেহ এও তোমার সৃষ্টি। তোমার চরণে তোমার দেওয়া এই দেহ আমি নিবেদন করছি।—

ধন্য তব পুণ্যরূপ মাঝে
লুপ্ত কর আমার চেতন;
লহ দেহ লহ মন-প্রাণ
করি আজি আত্ম-নিবেদন।

সামীপ্য ঃ—

বৈকুণ্ঠে ভগবানের কাছে থাকা নয়। এই জীবনে, এই পৃথিবীতে এই দেহে ভগবানের কাছে থাকা। আত্মনিবেদন না করলে বোধহয় তা হবার নয়। দেহ মন ভগবানে অর্পণ করে ভগবানের হয়ে যাওয়া। পরশমণি ছুঁয়ে হও সোনা, অজপ-যাগে অনুরাগে জাগাও চেতনা, নামরূপে রাখ নিশানা। / যার হিয়ার মাঝে সে বিরাজে রে, শুধু সে পায় ধামের ঠিকানা।

এলে যদি যেয়ো না চলিয়া
কর হেথা চির বাসভূমি ;
যা আছে এ ভগন কুটীরে
সব-জোড়া হয়ে থাক তুমি।

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহর ; সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও। ভক্ত এখন যুক্ত-যোগী। মধু বঁধু মধু তুমি তব সঙ্গ মধুময়।

সাযুজ্য ঃ

যুক্তযোগীর অবস্থা—সাযুজ্য অবস্থা। চিনি হয়ে যাওয়া নয়, এক সারকিটে থাকা। মুখের কথা নয়, অজপ-যাগে জাগতে হবে।

পাপপুণ্যে আলোকে আঁধারে
তুমি-আমি রয়েছি ডুবিয়া,
তুমি-আমি ক্ষিপ্ত নীল-জলে
দিয়েছি হে তরঙ্গ তুলিয়া।
তুমি-আমি দেবেন্দ্র-ইন্দ্রাণী,
তুমি-আমি শিব-ভগবতী,
তুমি-আমি বিষ্ণু পদ্মালয়া
তুমি-আমি পুরুষ-প্রকৃতি।
নীরব এ স্তব্ধ বিশ্ব জুড়ে'
তুমি আর আমি শুধু আছি ;
অনন্ত জাগ্রত তুমি-আমি,
তুমি-আমি সর্বভূতে বাঁচি।

সাযুজ্যে ভক্তই ভগবান।—

আমার আমিত্ব মহাঘটা
পেয়ে তব স্বামিত্বের ছায়া,

কবে কোন্ মাহেন্দ্র-মুহূর্তে
ধীরে ধীরে তেয়াগিল কায়া।
স্তব্ধ আজি আনন্দ-বিষাদ,
ভূত-ভবিষ্যৎ সমুদয় ;
বিরাজিত বর্তমান শুধু,
এক মাঝে একের তন্ময়।

এই মোক্ষ বা নির্বাণ। সদগুরুপন্থীদের মোক্ষ লক্ষ্য নয়। তারা চায় প্রেম ভক্তি। দরবেশজী একে বলেছেন শান্তাবস্থা। সদগুরু সাধনে এ অবস্থা আসতেই হবে, গীতার সাধন এবং ভক্তি দুই সদগুরু সাধনের অঙ্গ—এইখানেই বৈশিষ্ট। যে যাই বলুক, যত সর্টকাট দেখাক, উচ্চশক্তির ট্যাবলেটে বিশ্বজ্ঞানের আশ্বাস দিক, সাধন না করলে শান্তাবস্থা আসে না, শান্তাবস্থা না হলে ভক্তি কোথায়? জ্ঞান না হলে ভাব হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান না হলে লীলা আস্বাদন অসম্ভব।

বৈষ্ণব ধর্মের ভাবভক্তি হলে জ্ঞানের দিকটা কখনো নিবে যায় না। নাচা-কোঁদা, কান্নাকাটি, মাতামাতি করা—এ সকলকে তো আর ভাব বলে না। ভাব বড় সহজ নয়—গোঁসাইজী। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে—

ক্ষ্যান্তির্ব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা, নাম গানে সদারুচিঃ॥
আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদবসতি স্থলে
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

সাধন ভজন না করে এমনি এমনি এসব গুণ জন্মায় না। ব্রহ্ম-জ্ঞান না হলে আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে এবং প্রীতিস্তদবসতিস্থলেই বা কি করে হবে? বিশ্বরূপী বিশ্বেশ্বর জ্ঞান হওয়া চাই। এক কথায় বিশ্বরূপে বিশ্বেশ্বর জ্ঞান হয় না। কেমন করে হয়—তা তো দেখলাম।

আদৌশ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
তততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেমণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

গোঁসাইজী বলেন—ভাব বৃক্ষ, ভক্তি পুষ্প প্রেম সুপক্কফল। ব্রহ্মজ্ঞান, অবতারতত্ত্ব আর নরলীলা পরস্পর বিরোধী তো নয়ই—পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম ভক্তির পথে এইগুলিই ষ্টেপেজ। গোঁসাইজী বলেছেন—

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ; চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ—যা কিছু সকলই অদ্বয় ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রুতিতে বলেছেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জীয়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপাসতে। যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াছেন, যাহা দ্বারা বলেন নাই। পঞ্চমীতে রেখেছেন—করণার্থে তৃতীয়া করেন নাই। 'যাহা হইতে' যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট, স্বর্ণ হইতে কুণ্ডল, সমুদ্র হইতে তরঙ্গ ইত্যাদি। মৃত্তিকা ও ঘট একই বস্তু, মৃত্তিকার একপ্রকার পরিণাম ঘট, স্বর্ণের একপ্রকার পরিণাম কুণ্ডল, সমুদ্রের একপ্রকার পরিণাম তরঙ্গ। তা হলেও ঘটকে মৃত্তিকা এবং তরঙ্গকে সমুদ্র বললে হবে না। ঘটই বলতে হবে, তরঙ্গই বলতে হবে। সেইরূপ ব্রহ্ম অদ্বয় আর চরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তারই পরিণাম। তাই এই প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। 'কুম্ভকার এবং ঘট,' এই প্রকার দৃষ্টান্ত তারা দেন নাই। যত কিছু সমস্তই ব্রহ্ম। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এই মালাটি, এই অস্থি, মাংস, আমি,—সবই ব্রহ্ম। ইহাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান। এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান হলেই সগুণ ব্রহ্মত্ব বুঝতে পারে। নির্গুণ অদ্বয়ত্ব স্ফূর্তি না হলে সগুণ সাকার বুঝবার

কি সাধ্য আছে? সাকার কি এমনই সোজা কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম,

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

এই নির্গুণ পরব্রহ্মই আবার সাকার হয়ে লীলা করছেন। কাক ভুশুণ্ডীর পর্যন্ত সংশয় জন্মেছিল। 'সেই নির্গুণ পরব্রহ্মই কি দশরথ তনয় শ্রীরামচন্দ্র?' তিনিই কি এই অযোধ্যায় দশরথের ঘরে? একদিন শ্রীরামচন্দ্র বারান্দায় হাতে করে খাবার খাচ্ছেন, কণিকা মাটিতে পড়ছে আবার তা তুলে নিচ্ছেন। কাকভুশুণ্ডীকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র একটু হেসে ধরবার জন্য শ্রীহস্ত বাড়ালেন, ভুশুণ্ডী ভয়ে পালাল। কিন্তু হাত তার পেছনে পেছনে চলল। কাকভুশুণ্ডী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে লাগলেন, শ্রীহস্তও তার পেছনে পেছনে। অবশেষে আর কোথাও স্থান না পেয়ে, পুণরায় দশরথের আঙিনার ধারে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রামচন্দ্র একটু হাসলেন। তখন ভুশুণ্ডী রামচন্দ্রের মুখের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, লোক লোকান্তর, চতুর্দশ ভুবন সমস্তই রামচন্দ্রের মুখের ভিতর বর্তমান। কত ব্রহ্মাণ্ডে কত শত রাম বিরাজ করছেন। নিজেকেও ভুশুণ্ডী ঐরূপ একস্থানে দেখলেন। এ সকল দেখে ভুশুণ্ডী তো অবাক। শ্রীরামচন্দ্র তখন আবার একটু হাসলেন।—ভুশুণ্ডী অমনি মুখ থেকে বার হয়ে পড়লেন। প্রত্যক্ষ এ সমস্ত দেখলেন তথাপি সন্দেহ দূর হল না। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাকে কৃপা করলেন, অদ্বয় ব্রহ্মত্ব ও সগুণ সাকার লীলাতত্ত্ব তার কাছে প্রকাশ হল। ভুশুণ্ডী তখন সমস্তই বুঝলেন।

মহাপ্রলয়ে সকল কিছুই আবার বিনষ্ট হয়—একমাত্র ব্রহ্ম থাকেন। ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় বস্তুই যখন নাই, তখন আর

কিছুই থাকে না এরূপও বলা যায় না, থাকে এরূপও বলা চলে না। ব্রহ্ম নিত্য, সুতরাং সমস্তই নিত্য।

অনাদি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্বত্রই রয়েছেন—এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে তার উপাসনা করা, ধ্যান করা সহজ। সাধকেরা প্রথমে এই ব্রহ্মজ্ঞানেই উপাসনা করে। অবতারতত্ত্বে, লীলাতত্ত্বে বিশ্বাস অনেক পরে। যিনি ঠিক আমাদেরই মত খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন রোগের যন্ত্রণায় গেলাম রে, মলাম রে বলে চীৎকার করছেন। ছটফট করছেন, শোকেতে অস্থির হয়ে 'কোথা গেল রে, কোথা গেলে পাব রে' বলে দেশদেশান্তরে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনো ক্ষুধায় কাতর হচ্ছেন, কখনো বা পিপাসায় অস্থির হচ্ছেন—ইনিই সেই সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, আনন্দময়, চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বর ইহা বিশ্বাস করা কি তামাসার কথা? যিনি তাকে দয়া করেন সেই ভাগ্যবান মাত্র তাকে বুঝতে পারেন।—তা না হলে কারুর সাধ্য নাই। স্বয়ং ব্রহ্মার পর্যন্ত এতে সংশয় হয়েছিল। ব্রহ্মা ভাবলেন—এ কি কখনো সম্ভব যিনি মাঠে মাঠে হৈ হৈ করে গরু চরাচ্ছেন, বৃষ্টিতে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়াচ্ছেন, খেলায় হেরে গিয়ে রাখাল বালকদের কাঁধে, নিচ্ছেন তাদের সঙ্গে লাফালাফি ছুটোছুটি করছেন। কখনো কাদায় পড়ছেন আছাড় খাচ্ছেন, আবার চুরি করে ভয়ে জড়সড় হয়ে পালাচ্ছেন—ইনিই কি সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, গোলকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ? এই গোকুলে? আচ্ছা দেখা যাক, এই ভেবে তিনি অকস্মাৎ গোবৎস, রাখালগণ, বেণু, যষ্টি ইত্যাদি সমস্ত হরণ করে, পর্বতের এক গুহায় লুকিয়ে রাখলেন। দরজায় একখানি পাথর চাপা দিয়ে চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার কর্ম বুঝে তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত মধ্যে নিজেই গোবৎসহ, রাখাল বালক, বেণু, যষ্ঠি, শিঙ্গা, সিকা, হাড়ি, লাঠি সমস্তই হলেন। কেহই বিন্দু মাত্র জানতে পারলেন না।

বলরাম সেদিন গোষ্ঠে যান নাই। বৎসগণের প্রতি গাভীগণের, সন্তানদিগের প্রতি গোপীগণের পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ ভালবাসা দেখে বলরাম ভাবলেন এ কি? এমনটি তো পূর্বে আর কখনো দেখি নাই, এ যে সমস্তই অদ্ভুত দেখছি। তিনি কিছু স্থির না করতে পেরে ধ্যানে বসলেন। তখন তিনি সমস্ত জানতে পারলেন।

একটি বৎসর এইভাবে চলে গেল। পরে ব্রহ্মা এসে দেখলেন, তিনি যে ভাবে ঐসব রেখে গিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই সমস্ত রয়েছে। তিনি একবার পর্বত গুহায় আর একবার গোষ্ঠে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। পরে একেবারে অবাক হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে এসে পড়লেন। স্তব করতে লাগলেন—প্রভো আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি অবোধ। সন্তান জননীর কোল থেকে কত অত্যাচার করে, লাথি মারে তাতে কি জননী ক্রোধ করেন? তুমিই ধন্য, ধন্য ব্রজবাসীগণ, এ ব্রজের বৃক্ষলতাও ধন্য—কারণ তাঁরা তোমার ও ব্রজবাসীদের চরণধুলির স্পর্শ পায়। দয়া করে আমায় ব্রজের বৃক্ষলতা করে রাখ।

গ্রন্থাদিতে যেমনটি লেখা রয়েছে, শ্রীবৃন্দাবনে নিয়মিত বাস করলে ক্রমে ক্রমে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভগবানের নরলীলা তাঁর কৃপা না হলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও বোঝবার যো নাই, মানুষের কথা কি?

সদগুরু-পন্থীরা তবে কোন দলের সাধক? তাদের সঠিক পরিচয় কি? দরবেশজী এক চিঠিতে লিখেছেন—

গোঁসাই অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তিনি নানক পন্থী মহাত্মার মন্ত্রশিষ্য, শংকরাচার্য্যের দশ নামী সন্ন্যাসীর সরস্বতী মঠের সন্ন্যাসী এবং অদ্বৈত বংশের সন্তান ও মহাপ্রভুর নিকট কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণব। সুতরাং যে তিনদল সাধু ভারতে প্রধান, নানক পন্থী, দশনামী

সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব—এই তিন দলের যে কোন সম্প্রদায় ধরেই আমরা পরিচয় দিতে পারি। তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমই আমাদের লক্ষ্য, মোক্ষ বা নির্বাণ নহে। অধিকন্তু আমরা অদ্বৈতবাদী নহি, মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী। সুতরাং মাধ্বাচারী বৈষ্ণবই আমাদের যথার্থ পরিচয়।

ভক্ত—লীলা

ভক্তের মনে শান্তাবস্থার স্মৃতি জেগেছে। সেদিনও প্রকৃতি এমন মধুময়ী ছিল। দশদিক আলো করে চির সুন্দরের রথ এসেছিল। স্থাবর জঙ্গম কত আদরে তাকে বরণ করেছে। সে আনন্দের হাটে আমিও ছিলাম। সকলের সাথে আমিও যে তাঁর জয়গান করেছিলাম। আত্মনিবেদনও করেছিলাম। তারপর তো আর মনে পড়ছে না।

তারপরে যে হ'ল কিবা,
জানি নে তার নিশি-দিবা,
কি হল আর নাই সমাচার,—
ছিলেম অচেতনে।

নিজকে হারায়ে আর কি ভাল লাগে। আমি নতুন করে জাগবো।

দাও মোর 'আমি' জাগিতে,
তব পরশিত পাবিত হিয়ায়
নব 'আমিত্ব' মাখিতে।

ছাখো এই পৃথিবীর সবাই যেন তোমার সাথে মিশে যেতে চাইছে। এক হয়ে যেতে চাইছে। সেই এক কেমন, সে কি তুমি?

আমি ভাবি বঁধু, আমি নাই যেথা,
তুমি বা কেমনে রহিবে গো সেথা।

ভক্ত যেখানে ভগবান সেখানে। ভক্ত ছাড়া কি কাব থাকেন?

অগ্নি ছাড়িতে পারে কি দাহন,
সূর্য লুকাতে পারে কি কিরণ,
জীবন শাসিতে পারে কি মরণ,
আধেয় আধার ভুলিতে ?

আমার আমিত্ব যতই জাগবে ততই তুমি ধরা পড়বে। আমি যখন থাকি না তখন তুমি ভাবাতীত, জ্ঞানময়, নির্গুণ নিরাকার, কিন্তু তুমি যে অনিন্দ্যসুন্দর রূপও ধারণ কর। তোমার সেই রসময় প্রেমময় মধুময় রূপ আমি যে দেখেছি।

রসের লাগিয়া রূপের গড়ন,
তাই সাধ নাই মরিতে।

প্রিয় হে তুমি প্রকৃতিতেই ধরা দাও। অনুপমা প্রকৃতির শোভা সরোবরে তুমি পড়িয়াছ ধরা বিশ্বের বাসরে। বিশ্ব প্রকৃতি তোমার মিলন আকাঙ্ক্ষায় ঋতুতে ঋতুতে সাজ পাল্‌টায়। আমিও, তোমার প্রথম আলো হেরেছিনু পথে, / প্রেমময়ী প্রকৃতির মনোময়ী রথে।

এখানে 'প্রেমময়ী প্রকৃতি' বলতে প্রিয়তমা নারীকেও বোঝাতে পারে। দরবেশজীর আত্মজীবনীতে মা সরোজবালার কথা যতটুকু জানা যায় তাতে দেখেছি কিভাবে শ্রীমা দরবেশজীকে অধ্যাত্ম-পথে এগিয়ে দিয়েছেন। মা যোগমায়ার মধ্যেও গোঁসাইজী একদিন ইষ্টের অবির্ভাব দেখেছিলেন।

ওঁদের কথা বাদ দিলেও নিজে দেখেছি নবানুরাগে প্রিয়াকে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার ওপারে মনে হয়। মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে, মরুতীর হতে শুধা শ্যামলিম পারে। প্রিয়া আর দেবতা (ভগবান অর্থে) এক হয়ে যায়। দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

গোঁসাইজী বলেছেন, একটি মানুষকেও যদি সত্যি সত্যি

ভালবাসা যায় তবে উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সাংসারিক ভালবাসায় শেষে আর মন ভরে না। ঠিক ঠিক ভালবাসাও বুঝি আর থাকে না। অসীম ক্ষমায় ভালমন্দ মিলায়ে দেখতেও আর পারি না, স্বার্থ গন্ধে নষ্ট হয়ে যায়। কৃষ্ণরতি প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম। সে প্রেমের আভাষ জাগতিক ভালবাসায় পাওয়া যেতে পারে। ভগবৎ প্রেমানন্দই আসল আনন্দ, সংসারে স্বামী স্ত্রীও যদি সেই একজনের প্রেমে পড়েন তবে তাদের মধ্যে কমরেডশিপ্ গড়ে ওঠে। আসিবে বলিয়া সে রাধারমণ, তারা কত না অর্ঘ্য করে বিরচণ, কত না কুসুম করে যে চয়ন চরণে তাঁর সঁপিতে চায়। তাঁর প্রীত্যর্থেই সকল কাজ করেন। স্ত্রী-পুরুষ বোধও থাকে না—

আজি নব-জাগরণে হে মোর মরণ!
নারী-বেশে তাই মোরে সাজালে এমন?

ভক্ত একে একে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব আস্বাদন করে।

আমি দাসী গো জীবনে মরণে
রাখ আর মার যা কর তা কর
রহিব জড়ায়ে চরণে।

*   *   *

তুমি হে আমার পরানের স্বামী,
জনমে জনমে চির-দাসী আমি,
সকল চেষ্টা তব অনুগামী,
সকল সাধনা চরণে;
কখন তোমার কোন্ প্রয়োজন,
সেই সে ভাবনা আমার ভজন,
সকল কর্ম সকল যজন
সার্থক তব শরণে।

সখ্য :—

সমপ্রাণা সখা যথা—একপ্রাণ, একের কষ্টে অন্যের কষ্ট। আনন্দে আনন্দ।

মম সম্পদে ফুটে তব আলো,
আমার বিপদে তব মুখ কালো,
সম-বেদনার সান্ত্বনা ঢালো
সজল-জলদ-লোর।

এই সখ্য ভাব গুরুশিষ্যের মধ্যেও দেখা যায়। দরবেশজীর জীবনে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে রহস্যালাপের যে কথা শোনা যায়, তাতেই তাঁর রসিক সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পাই। আমি দরবেশজীকে একবারই মাত্র দেখেছি, তখন আমার বয়স বার এবং তিনিও অসুস্থ ছিলেন। সে বছরই তিনি দেহ রাখেন। তাঁর অতি কাছের শিষ্য-শিষ্যাদের যে রসবোধ এবং ব্যবহার মাধুর্যের পরিচয় আমি পেয়েছি তাতেই দরবেশজীর প্রেমিক রূপটি আমরা বুঝতে পারি।

মঠের উৎসবে এসে শিবানীদির দাঁত হারিয়েছে। বাঁধান দাঁত, বোধহয় খুলে শুয়েছিলেন অবলাদির ঘরে। ভুজঙ্গদা স্ত্রীর দাঁতের খোঁজে অবলাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, দিদি আপনার ঘরে ইঁদুর আছে? অবলাদি উত্তর দিলেন—এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি। এই রকম রসবোধ আছে বলেই অবলাদি আজীবন দরবেশজীর কাছে থাকতে পেরেছেন, শুধু ভাইঝি বা শিষ্যা বলে নয়। জীবনদির গানের খাতায় দেখেছি দরবেশজীর হাতের লেখায় রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এবং রজনীকান্ত সেনের রুচিপূর্ণ সংকলন। জীবনদি তার ষাট বছরের পুরনো গলায় এখনো যা গান করেন তাতেই বোঝা যায়, কেন দরবেশজী জীবনদির গান ভালবাসতেন। যোগানন্দ দাদার শিল্পকাজ, গোবিন্দানন্দজীর সংগঠনী

ক্ষমতা, ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর শিষ্য শরৎ মহারাজের চিত্রাংকন সকলই প্রকৃত উঁচুমানের। এদের নিয়েই তিনি বছরের পর বছর থেকেছেন। বন্ধুভাবে কত রসিকতা করেছেন। এই তো সখ্যতা।

দরবেশজীর চিঠিতে দেখা যায় শিষ্যদের জাগতিক দুঃখ কষ্টে তিনি কেমন ভাবে সাড়া দিতেন, আনন্দেও আনন্দ করতেন। মায়াবাদের দোহাই দিয়ে, তাঁর কাশী বাস, সন্ন্যাস, বয়সের দোহাই দিয়ে শিষ্যশিষ্যাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে দূরে থাকেন নি। সেই দরবেশজীকে ভালবাসি—

বন্ধু হে, তব ক্রন্দন-হাসি
নন্দন-লাস-মাখা ;

দাসী আমি তব চরণ-সেবার,
সখী আমি চির সুখ-বেদনার,
সব তরঙ্গে সঙ্গী তোমার
সম-তুলিকায় আঁকা।

বাৎসল্য :—

ভগবানকে পুত্ররূপে দেখাই বাৎসল্য। গোঁসাইজীর জীবনে ভগবানের বালকরূপে এসে দেখা দেওয়া, আব্দার করা, গয়না চাওয়া ইত্যাদি অনেক ঘটনাই লেখা হয়েছে। শ্রীশ্যামসুন্দরের সঙ্গে গোঁসাইজীর লীলা, বালক গৌরাঙ্গে নুপুর চেয়ে কাঁদা, সিদ্ধা গোয়ালিনীর 'ছেলেদুটির' জন্য পাতামোড়া ক্ষীরটুকু রাখা, বাৎসল্য রসের নিদর্শন।

আমার নয়ন-মণি!
শত জনমের সম্পদ-শোভা নন্দন-সুধা-খনি!

দরবেশজীর বাৎসল্য তাঁর শিষ্যদের জীবনে পরম আশীর্বাদ রূপে দেখা দিয়েছিল। সদগুরু শিষ্য করেন না গুরু করেন।

দরবেশজীও শ্রীমার কাছে তাঁদের শিষ্য-শিষ্যারা ছিলেন বাল-ভগবান। গুরুভ্রাতা শৈলেন গুহর মাথা ধরায় দরবেশজীর মাথা টিপে দেওয়া, মঙ্গলের জন্য মা'র ছানা তৈরী করে মিষ্টি বানান (মঙ্গল যে বাজারের খাবার খায় না), গাড়ীতে যোগাননের সাথে দরবেশজীর একপাত্রে আহার, পুরীতে মঙ্গলদাকে নিজের টিফিন ক্যারীয়ারের বাটি দুধ খেতে ব্যবহার করতে দেওয়া, (মঙ্গলদা 'কিন্তু কিন্তু' করলে দরবেশজী বলেছিলেন—গুরুঠাকুরের বাটি ব্যবহার করবো না! হারামজাদা তোরা এলি কোথেকে?) ইত্যাদি ঘটনা থেকেই দরবেশজীর অপরিসীম অপত্যস্নেহের কথা জানা যায়।

নিজের জীবনেও দরবেশজীর স্নেহস্পর্শে ধন্য হয়েছি। আমি কেন, তাঁদের অগণিত ভক্তশিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে এমন লোক কমই আছেন যারা তাঁদের স্নেহ-ধন্য নন্।

তোমার বিহনে গৃহ-প্রাঙ্গণে হুতাশের হাহাকার!
তোমার সেবনে তোমার সৌখ্যে,
স্বাদু-স্নেহে সুধা ঝরিছে বক্ষে,
সম্পদে সুখে বিপদে দুঃখে ঘিরে আছ চারিধার!
তুমি মোর সুধা সার!

মধুর:—প্রাণায়াম, নাম সাধনে তোমাকে আমি শান্তরূপে অন্তরে জানতে পেরেছি। তোমার সরস স্পর্শ আকাঙ্ক্ষায় তোমার সেবায় জীবন ধন্য করেছি। দুঃখ হতাশায় তোমার সৌখ্য আমাকে আনন্দ দিয়েছে। তোমার স্নেহস্পর্শেও আমি ধন্য। কিন্তু—

মন্দ তব গন্ধ যবে ছড়ায়ে দিল বসুন্ধরা,
মধুরময় মাধুরী মাঝে মধুর রস পড়িল ধরা।

যখন পাঞ্চভৌতিক দেহধারী হও তখন তোমার চারিদিকে পঞ্চরস জাগে।

কান্ত, তব কান্তি মাঝে পঞ্চরস পূর্ণতর,
মদন-মদে মাতিল তনু পরশ দিয়ে সরস কর।

মধুর ভাব দুই প্রকার। স্বকীয়া আর পরকীয়া। স্বকীয়ায় শুধু ভক্ত ভগবান। মিলনে বাধা নেই।

লুটেছে জীবন পরান-স্বামী;
সে যে গো আমার তার যে আমি।

পরকীয়াতে ভক্ত—ভগবান দূরে দূরে আছে। ভক্তকেও নিষ্কাম কর্ম করতে হয় তাঁরই নির্দেশে। দরবেশজীর বেলায় নির্দিষ্টদের সাধন দেওয়া, উপদেশ দেওয়া, শাসন করা, পড়াশুনা, বিয়ে-সাদি, সাধন ভজন, ব্যবসা-বাণিজ্য, রিলিফের কাজে বুদ্ধি দেওয়া এমনকি বাসা পরিবর্তন এবং নতুন বাসা ভাড়া করা বিষয়েও চিঠি লেখা। ভগবান যে ভক্ত সঙ্গের জন্য ব্যস্ত হয়ে আছেন। প্রভাতের বউয়ের স্বাস্থ্যোদ্ধার, অন্নদার কাগজ আর দেশসেবা, প্যারী-মঙ্গলের ব্যবসা, পরিমলের তর্ক, কালাচাঁদ, দীনেশ যোগেশের রেল, নন্তুর পড়াশুনা, কাশীর মঠের পুজো ইত্যাদি নিয়েই কি তুমি ব্যস্ত থাকবে? আমার কাছে আসবে কখন?

গৃহস্থালীর মস্ত কাজে,
ব্যস্ত থাকি সকাল-সাঁঝে,
তখন নাকি বনের মাঝে,
একলা যাওয়া যায়!
যখন তুমি বাজাও বাঁশী
শীতল তরুর ছায়।

আমার একান্ত নিজস্ব সময়ে তোমার জন্য বসে থাকি। তোমার সঙ্গে মিলিতও হই। অসময়ে, অন্যের সময়ে আমাকে এমন করে ডাকছো কেন?

যখন বহে তোমার হাওয়া,
বাগানের ফুল তুলতে যাওয়া,
দুপুর বেলা একলা নাওয়া,
সব হয়েছে করা।

এখন আমি কোন ছলনায়,
ভুলাই আজি কিসের কথায়
সাজায়ে কে দিবে আমায়,
অভিসারের সাজে ?

তোমার কেবল ছলের ভরা,
ইচ্ছা যাতে পড়ি ধরা,
বলো এখন কেমন করা
লোক-সমাজের লাজে।

নানান কাজ শেষ করে শুধু তোমার জন্যই যখন বসে থাকি, তখন তো সব দিন তোমার বাঁশী বাজে না।

সব আয়োজন ভেঙে-চুরে,
ধূর্ত তুমি বেড়াও ঘুরে
সময় মতন থাক দূরে,
এ কি বিষম দায়।
অসময়ে বাজাও বাঁশী
শীতল তরুর ছায়।

ভক্তের সকল কাজ, দেহ মন সমস্ত কিছুই ভগবানের প্রীতির জন্য, সুখের জন্য। কিন্তু সে শুধু মিলনের আনন্দেই মাতোয়ারা নয়—বিরহও আস্বাদন করে।

আজি এ বিরহ-সাঁঝে তোমা হারাইয়া
অনুরাগ এসেছে গো বিরাগ হইয়া।

ভক্ত ছাড়া ভগবান ভাবাতীত। ভক্ত নিয়ে যখন লীলা করেন, তখন তার অগণিত ভাবরাশি—

শান্ত হেরিছে তব অনন্ত
ব্রাহ্মী বরণখানি ;
দাসের কেবল চির-সম্বল
প্রভুর আদেশ-বাণী
সখার অমল সরল সঙ্গে
রঙ্গে দিয়েছ উঁকি
সব-বেদনায় ব্যথিত পরান,
সম-সুখে মহাসুখী।
চির স্নেহময়ী জননীর তুমি
চীর-অঞ্চলধন,
চঞ্চল তব মধুর পীড়নে
সুধা ঝরে অগণন।

হে বন্ধু, হে প্রিয়, তুমি সকল ভাবের অতীত। সমস্ত ভাবতরঙ্গের ওপারে তুমি স্থির। ভক্তদের জন্য, তোমার আপনজনদের জন্য তোমার এই খেলা। ভাবের খেলা, ভবের খেলা। আমার দেহই তোমার মন্দির। এর ভিতরে তুমি আত্মারূপে বসে আছ। রসিক তুমি, স্থির হয়ে ভাবতরঙ্গের খেলা দেখছ। তুমি আজ ভাবাতীত, আমি দিচ্ছি ধরা।

ধন্য মম অনুপম মন্দির-অন্দর
ধন্য তুমি ভাবাতীত সহজ সুন্দর !

(মন্দির রচনা করতে দরবেশজী মাত্র তিন সপ্তাহ সময় নিয়েছিলেন। শ্রীমা বলেছেন, তিনি দিন রাত লিখেছেন। কত দিন রাতের খাবার ঢাকা পড়ে রয়েছে। লিখতে লিখতে রাত ভোর হয়ে গেছে—খেয়াল হয়নি।)

সদ্গুরু মা

অজ্ঞান তিমির হে গুরু নাশ কর / জ্ঞানাঞ্জন নয়নে দাও। ভাগবতদা মা'র প্রথম শিষ্য।

দরবেশজীর তিরোধানের পর, অনেকেই অদীক্ষিত ছেলে-মেয়ে, বউ, নাতি-নাত্‌নী, ভাইদের দীক্ষার ব্যাপারে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মা'র কাছে যায়—মা এদের সাধন দাও। সদগুরু সাধন পেয়ে তো ধন্য হ'ক এরা। কোথায় যাব, তুমি ছাড়া কে আছে আমাদের। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগের মধ্যে এদের জন্ম। অতীতের ঐশ্বর্যমহিমা চেতনার প্রান্তে আজ বিভীষিকা মূর্তি ধরে। এই সমাজ বিপ্লবে এরা যে উদ্‌কেন্দ্রিক হয়ে যাবে। ঝোড়ো হাওয়ায় হারিয়ে যাবে। এদের তুমি অন্ধকার অরণ্যে পথ হারাতে দিও না। রুদ্ধশ্বাস দিশেহারা এদের তুমি পথ দেখাও, দাও অমৃত বাতাসের সন্ধান।

সুধীর বসু দরবেশজীর শিষ্য, ভজনশীল, তার স্ত্রীর সাধন হয়নি। স্ত্রীরও সাধনে মন। মা'কে গিয়ে বললেন সব কথা। মা তখন কলকাতায়—দরবেশজীর কনিষ্ঠ শিষ্য মনোজকুমার সাহার বাড়ীতে। মা বললেন, সে কি করে হবে—আমি যে গোঁসাইজীর অনুমতি পাইনি এখনো। তুমি বরং মেদিনীপুরে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে যাও, আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। শ্রীশ্রীকুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন সাধন দেওয়া বন্ধ রেখে গোঁসাজীর আদেশে আবার সাধন দিতে সুরু করেছেন তখন, সরোজবালার কাছ থেকে এসেছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে সাধন দিতে রাজি হলেন পণ্ডিত মশাই। এ রকমই করেন মা—বলেন হবে, কাউকে বা অন্য সাধকদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

ভাগবত তেওয়ারী দীর্ঘদিন দরবেশজীর সেবা করেছেন। কত উৎসবে ভোগ রান্না করেছেন, তাঁর সাথে সাথে ঘুরেছেনও কত জায়গায়। কত লোকের সাধন হ'তে দেখেছেন। দরবেশজীর অগণিত শিষ্য-শিষ্যাদের সবাই চেনে ভাগবতকে। ভাগবতদা। ভাগবত কখনো সাধনপ্রার্থী হয়নি এবং বোধ হয় সেই জন্যই দরবেশজীর তিরোধানের দিন কাশীতে তাকেই মন্দিরের দরজা খুলতে হল, মঠের আর সকলেরই একদিনের অশৌচ। তার পর কতদিন কেটে গেছে, ভাগবত এখনো ভোগ রান্না করে। মা'র সাথে ঘুরে বেড়ায় মাঝে মধ্যে। ১৩৫৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস, মা পুরীতে গোঁসাইজীর উৎসবে এসেছেন। ভাগবত এসেছে মা'র কাছে। এক রাতে ভাগবত ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। তন্দ্রাবস্থায় দেখলো দরবেশজী, গোঁসাইজী তাকে মা'র কাছে সাধন নিতে বলছেন। বেলা এগারটা নাগাদ মা'র পুজো শেষ হলে সাধনপ্রার্থী হল ভাগবত। বড় আশা করে এসেছি গো, কোলে তুলে লও। ফিরাইয়ো না জননী। মা যথারীতি তাকে দীক্ষা দিলেন। মা'র নতুন রূপ উদভাসিত হল, সদগুরু মা। মা গো আমার মা, আমার দৃষ্টি ছেড়ে, তুমি কোথাও যেও না।

ধানবাদের ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগ্যবান পুরুষ, ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের শিষ্য, দরবেশজীর গৃহীজীবনের জ্ঞাতি ভাইপো। এগারটি সুপুত্রের জনক, তিনি সময়, সুযোগ এবং সুবিধা পেয়ে বিরাট পুরুষাকারে সাধনে ব্রতী হন। সাধনে এবং গুরুকৃপায় তিনি বর্তমানকালের এক আদর্শ সংসার স্থাপন করেছেন। সুরসিক ক্ষিতীশদার ছয় ছেলে, শ্যামাপ্রসাদ, কালীপ্রসাদ, রমাপ্রসাদ, বদ্রীপ্রসাদ, বিশ্বপ্রসাদ এবং শিবপ্রসাদ মার কাছে গুরুধামে সাধন পান। প্রথম পাঁচজন দরবেশজীর আশ্রিত। সহজ, সরল, অমায়িক, ধানবাদের ভাইয়েরা প্রতি বছর কাশীর মঠে উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দ বর্ধন করেন।

সত্যহরিবাবুর মা বাবা দু'জনেই গোঁসাইজীর শিষ্য। সত্যহরি ধার্মিক বৈষ্ণব। গোঁসাইজীর কাছেই দীক্ষা হল না—আর কোথায় সাধন নেব এইভাবেই তাঁর দীর্ঘদিন কেটে গেল। কলকাতা হাইকোর্টের এ্যাটর্নি, আইন ব্যবসা করেন আর বাড়ীতে বৃদ্ধা মায়ের সেবা। ধর্মালোচনা, গোঁসাই প্রসঙ্গ এবং গ্রন্থাদি পাঠে তিনি আনন্দ পান। সেবার এলাহাবাদ গিয়েছেন বৈষয়িক কাজে। ফেরার পথে, বেনারসে কে যেন জোর করে নামিয়ে দিল তাঁকে। সোজা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠে মা সরোজবালার কাছে সাধন প্রার্থনা করে বসলেন। আমি যে অন্নপূর্ণার নির্দেশ পেয়েছি মা। সাধন দাও। দিতেই হবে। মা বললেন আচ্ছা হবে 'খন। তুমি বাপু, আজই কলকাতায় যাও। সত্যহরি কলকাতা এসে দেখেন তাঁর মা কঠিন অসুখে পড়েছেন। সত্যহরিবাবু পরে শ্রীমার কাছে সাধন পান। তিনি খুব বিনয়ী মানুষ। পুরীর আশ্রমে তিনি পায়ে হেঁটে ঢোকেন না—সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে মন্দিরে আসেন।

গতিদা, গতিনাথ সান্যাল, রাজ্যের বাচ্চাদের মা'র কাছে সাধন দেওয়াবার জন্য আন্‌তে সুরু করলেন। মা'ও সাধন দিচ্ছেন প্রায় সকলকেই। হীরেনদার ছেলে অমিতাভের তখন কতই বা বয়েস হবে। লেকটাউনের শান্তিদার ছেলে শিবশংকর এবং বিষ্ণুশংকরের যখন সাধন হয় তখন ওরা আট এবং পাঁচ বছরের। দরবেশজীর অনেক প্রতিষ্ঠিত শিষ্যেরা কথা তুললেন—এ কি হচ্ছে? এ সব শিশুদের কি নাম মনে থাকবে? বাবা মা মনে করিয়ে দেবে যদি ভুলেই যায়। এ পর্যন্ত নাম ভুলে যাওয়ার খবর খুব কম এসেছে। অনেক বাবা-মা শিশুর কথা বলার সময় মুখে ইষ্ট নাম ফুটতে দেখে বিস্মিত হয়েছেন। একদল তবু মা'র সাধন সম্বন্ধে সন্দিহান হলেন।

কাস্তোড়ের ত্রিলোচন চক্রবর্তি মা'র কাছে সাধন নিয়ে কাশীর

মঠে সেবা পুজো নিয়ে আছেন। বয়স প্রায় ত্রিশ। মা যখন সাধন দেন, সে সময় ত্রিলোচনও থাকে মাঝে মাঝে। দেখে, মা একটা কৌটা থেকে একখানা সাদা কাগজ বের করে নাম বলে দেন। ত্রিলোচন ভাবল, মা নিশ্চয় কৌটোর কাগজে নাম লিখে রেখেছেন। কাগজখানা হাতাতে পারলে সব নাম জানা যাবে। একদিন মা স্নান করতে গেছেন, ত্রিলোচন চট করে ঘরে ঢুকে কৌটোর কাগজখানা বের করল। কিন্তু সে নেহাতই এক সাদা কার্ড—কিছুই লেখা নেই তাতে। পরেও ত্রিলোচন ঐ কাগজ থেকে মাকে নাম বলতে দেখেছে।

যতীন মিত্র মশাই দরবেশজীর শিষ্য। কাশীতে বেড়াতে গেছেন—ভীষণ জ্বালার হাত থেকে রেহাই পেতে। কিছুতেই শান্তি নেই। সংসারেও অশান্তি, স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, চাকুরীস্থলেও নানান ঝামেলা। নারায়ণদাসজী তখন মঠের মহান্ত। তিনি তুলসীর মালা ধারণের নির্দেশ দিলেন। বিশ্বনাথের গলি থেকে মালা কিনে মঠে ফিরলেন। মালা পকেটে মা'কে প্রণাম করতে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকতেই মা বললেন, তোমার মালাটালার প্রয়োজন নেই—এমনিতেই শান্তি পাবে। প্রণাম করে বেরিয়ে এল যতীনদা। বুড়ি মালার খবর পেল কি করে—জ্বালাও তৎক্ষণে সরে পড়েছে। কি হবে তিলক মালা বাহিরের সাজ। শ্বাস যদি বশ মানে সেই বড় কাজ।

মা এখন সবসময় অন্য জগতে থাকেন। ধন্যা বসন্তদিদি সর্বাবস্থায় মা'র সেবা করে যাচ্ছেন। মা' দরবেশজীর অনেক নামী শিষ্যদের চিনতে পারেন না, পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। ব্যক্তিবিশেষের সামনে ঘোমটাও দেন টেনে। মায়ের মাথাটাথা খারাপ হয়নি তো। সে যাই হোক মায়ের শিষ্যদের নাম গণতালিকায় তোলা যাবে না। মা'কে বললেন তারা—পঞ্চায়েত সভার সভ্যেরা। 'সেকি,

তোরা ওদের মঠে ঢুকতে দিবি নে'। মা'কে দিয়ে মিথ্যে চিঠিও একটা সই করিয়ে নিল তারা। শুরু হল আন্দোলন। মনে আছে ১৯৬১, বাংলা ১৩৬৮ সালে কাশীর মঠে গোঁসাইজীর জন্মোৎসবে এ ব্যাপার নিয়ে বেশ আলোচনা হয়। গুরুভ্রাতা মঙ্গলচাঁদ দাস, ৺নরেশচন্দ্র সেন, শ্রীবিমলেন্দু সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মায়ের সাধন যথার্থ সাধন এবং মা'র শিষ্যদের মঠের গণতালিকা ভুক্তির সমর্থনে আন্দোলন করেন। মঠের বাৎসরিক সভায় মা সভাপতিত্ব করেন। অন্যদের সাথে আমি মা'র শিষ্যদের জন্য আলাদা মঠ স্থাপনের প্রস্তাবও করি। মা, দরবেশজী এবং গোঁসাইজীর আশীর্বাদে বিমলেন্দুবাবুর (নন্তুদা) হাকিমী হস্তক্ষেপে দীর্ঘ চার বৎসর পর ব্যাপারটা মিটে যায়। ১৯৬৩-৬৬ এই চার বৎসর আমায় মঠে না যেতে হলেও, ১৯৬৭ থেকে মা'র আশীর্বাদে নিয়মিত মঠে যাচ্ছি। বিষয়টি কতদূর গড়িয়েছিল তার নিদর্শন হিসাবে একখানা চিঠির উদ্ধৃতি করছি—

প্রিয় মহাশয়গণ,

কাশীর মঠে গত ১৩৭০ সালের জন্মোৎসব ও বার্ষিক সম্মেলনের সময় শ্রীশ্রীমা দেবী সরোজবালার শিষ্য ও শিষ্যাগণের নাম মঠের দেবোত্তর পত্রে বর্ণিত নাম ও গণতালিকা ভুক্ত করা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে আপনাদের ব্যবহারে যে বাদানুবাদ ও তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্পর্কে আপনাদের আবার পত্র লিখিবার প্রবৃত্তি হইতেছিল না কারণ আপনাদের অবিবেচনা ও অমনোযোগিতার ফলে আপনারা যে ক্রমশ মঠকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছেন এবং শ্রীমার লেখা বলিয়া কথিত একখানি গোপন করা পত্র দীর্ঘ দশ বৎসর পরে সন্দেহজনক ভাবে ঝুলি হইতে বাহির করিয়া এবং আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীমার সম্বন্ধে নানাবিধ গর্হিত ইংগিত করিয়া তাঁহাদের

ব্যক্তিগত চরিত্রের যে পরিচয় উদঘাটিত করিয়াছেন তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান সত্ত্বেও আপনারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া যে যার বৈষয়িক কর্ম্মে ফিরিয়া গিয়াছেন। ট্রাষ্টী হিসাবে তো দূরের কথা, সাধারণ গুরুভাই হিসাবে এবং মঠের হিতকামী হিসাবে আপনাদের উপর আমাদের বিশ্বাস ও ভক্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন স্বভাবতই চিন্তা হইতেছে যে আপনারা সকলেই আপনাদের বিশেষ বিশেষ সহযোগীর মত কোন স্বার্থের জালে জড়াইয়া পড়িয়া মঠের মংগলকে গৌণ করিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন কিনা। যদি তাহাই হয়, তবে আর একবার আপনাদের বিবেকের নিকট আবেদন করার বাসনা লইয়া পূর্ব্বের অপ্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিলাম। কেন না আপনারা কেহ কেহ হয়ত সদিচ্ছা হইলে এখনো মঠকে ধ্বংসের হাত হইতে অক্ষতভাবে বাঁচাইতে পারেন। আমাদের সে চেষ্টায় মঠ বাঁচিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্ভবত আধমরা হইয়া বাঁচিবে। শ্রীঠাকুর এখনো আপনাদের সুবুদ্ধি প্রদান করুন, এই প্রার্থনা।

গত ২৩-৬-৬৩ তারিখ আমি কলকাতা হইতে আপনাদের নিকট শ্রীমার শিষ্যগণের নাম মঠের গণতালিকা ভুক্ত করার স্বপক্ষে দেবোত্তর বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে পত্র দিয়াছিলাম, সেই পত্র পাইয়া শ্রীমার গত জন্মোৎসব উপলক্ষে আপনারা তিনজন ট্রাষ্টী কাশীতে সমবেত হন এবং অন্য দুইজন ট্রাষ্টীর অসাক্ষাতে (উহা নীতিবিগর্হিত) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আপনাদের মধ্যে একজন দুইটি অস্ত্রে আপনাদের বুদ্ধি ও বিবেক বিকল করিয়াছিলেন। প্রথমত শ্রীমার লেখা বলিয়া কথিত ১৪. ১০. ৫৩ তারিখের একখানি চিঠি এবং দ্বিতীয় একটি অসত্য উক্তি যে শ্রীদরবেশজী দেহে থাকা অবস্থায় নাকি বলিয়াছিলন যে শ্রীমার প্রদত্ত সাধন যথার্থ সাধন নহে। এই

দুইটি ভাওতায় আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনারা আর ব্যাপারটি লইয়া মাথা ঘামান নাই বা অন্যান্য দুইজন অনুপস্থিত সহযোগীকেও কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেন নাই। বরং কাশী হইতে ফিরিয়া গিয়া দেবোত্তর পত্রের বিধানমত কী করিয়া শ্রীমায়ের শিষ্যদের বঞ্চিত করা যায় তাহার উদ্দেশ্যে ফরমাস মত আইনের ব্যাখ্যা খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে আপনারা ব্যক্তি বিশেষের কুটচক্রে নিজেদের সামান্য বুদ্ধি বিবেচনাও কাজে লাগান নাই, অন্যদিকে দুইজন ট্রাষ্টীর অসাক্ষাতে এবং অজ্ঞাতে একজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির খপ্পরে পড়িয়া একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নীতিজ্ঞানহীনতার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন।

এখন দেখা যাক, যে দুইটি ধাপ্পায় আপনাদের ভোলান হইয়াছিল উহাদের স্বরূপ কি। শ্রীমার ১৪-১০-৫৩ চিঠি যদি জাল না হয়, তবে উহার উৎস কোথায়? বাংলা ১৩৫৫ সালের বার্ষিক সভায় শ্রীমার শিষ্যদের নাম গণতালিকাভুক্ত করার স্বপক্ষে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল, সে সভায় শ্রীমা স্বয়ং স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমা এবং ট্রাষ্টীরা সেই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন। কেহই কোন বিরোধিতা করেন নাই। এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ১৩৫৮ সালে হঠাৎ এই প্রস্তাব নাকচ করিবার চেষ্টা হইল কেন? শুধু তাহাই নহে, যে কথা বা মতামত শ্রীমা নিজেই দিতে পারিতেন, তাহার জন্য একখানা চিঠি লিখাইবারই বা কি প্রয়োজন হইল? আবার সেই চিঠিই বা কেন দীর্ঘ দশ বৎসর অন্যান্য ট্রাষ্টী ও মঠের সমস্ত সভ্যগণের নিকট হইতে গোপন রাখা হইল? নিঃসন্দেহে দেখা যাইতেছে যে এই ব্যাপারে একটি গভীর ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং তাহার নায়ক কে ছিলেন তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীমাকে অসহায় জানিয়া তাঁহাকে দিয়া অতি নির্মমভাবে

এই চিঠিখানি অত্যন্ত গোপনে dictation দিয়া লেখান হইয়াছিল। চিঠির ভাষা যে শ্রীমার নহে তাহা যে কোন গুরুভাই পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এই ঘৃণ্য কাজটি করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। শ্রীমা যতদিন দেহে ছিলেন ততদিনই মায়ের কণ্ঠ রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে কার্য সিদ্ধির আশায় পত্রখানি ১৯৫৩ সাল হইতে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত নিপুণ ভাবে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, যাহাতে কেহ শ্রীমাকে সাক্ষাৎ মত জিজ্ঞাসা করিয়া পত্রটি ও উহাতে বিবৃত মতামতের সত্যাসত্য ও পত্ররচনার ইতিহাস জানিবার কোন সুযোগ না পায়। শ্রীঠাকুর দেহে থাকিতে যাঁহারা তাহাকে নানাবিধ লাঞ্ছনা দিতে কসুর করেন নাই, তাহারা যে শ্রীমায়ের উপর এই ধরণের ব্যবহার ও নির্যাতন করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এই ধরণের তঞ্চকতার কথা বৈষয়িক ব্যাপারেও কদাচিত শোনা যায়। ব্যক্তিগত চরিত্র কতদূর ঘৃণ্য হইলে এবং মানুষ কতদূর স্বার্থান্ধ হইয়া অধঃপাতে গেলে এই আচরণ গুরুর মঠের সম্পত্তির উদ্দেশ্যে এবং গুরুমাতার সম্বন্ধে সম্ভব হইতে পারে, তাহা কল্পনারও অতীত।

উক্ত ১৪-১০-৫৩ তারিখের পত্রে যে কথা বলা হইয়াছে, উহা যে শ্রীমায়ের নিজস্ব মতামত বা নির্দেশ নহে তাহার স্বপক্ষে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিতেছি (পত্রখানি ১৯৯১ অব্দের ৫ই চৈত্র ১৫২নং হারাবাগ হইতে লিখিত):—

সাধারণতঃ প্রথমে যে কথা বলা হয় তাহাই আমার নিজের কথা, পরে প্রতিবাদ হইলে, আমার ধর্মই এই যে, আমি প্রতিবাদকারীর মতেই মত দেই এবং সেও উৎসাহে দশজনের কাছে 'ঠাকুর বলিয়াছেন' বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের ছাপ মারা অথচ তাহার নিজেরই কৃত সেই কার্যের জন্য সু বা কুফল ভোগ করে। দেখা যাইবে শ্রীমা ১৩৫৫ সালের বার্ষিক সভায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার শিষ্যগণকে তালিকাভুক্ত করার পক্ষে যে মত দিয়াছিলেন উহাই তাঁহার নিজের মত। পরে অত্যাচারিত হইয়া এবং অন্যায় চাপে পড়িয়া যে কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, উহা সেই পত্রের রচনাকারীর বিকৃত মনের ঘৃণ্য রূপ। শ্রীমা উহার নাচার লেখিকা মাত্র। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আজ যাহারা শ্রীমার চিঠির প্রচার করিয়া কিস্তিমাত করিতে চাহিতেছেন, তাহারা যে পত্রের উল্লেখিত মতামতের কোনই মর্যাদা দেন না, তাহার প্রমাণ যে পত্রটি তৎকালীন ট্রাষ্টী স্বর্গত কুঞ্জবিহারী গুপ্ত ও শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষকে আদৌ দেখান হয় নাই এবং পত্রের শেষের বাক্যের নির্দেশ মত উহা গত দশ বৎসর শ্রীমার দেহে থাকা অবস্থায় বার্ষিক সভায় পেশ করাও হয় নাই। যাহারা পত্রখানিকে দশ বৎসর বাজে কাগজের বেশি মর্যাদা দেয় নাই, আজ তাহারাই ব্যক্তিগত প্রয়োজন সিদ্ধির কু মতলবে, 'মার চিঠি' 'মার চিঠি' বলিয়া ঢাক বাজাইতেছে এবং আমাদের ধোকা দেবার অপচেষ্টা করিতেছে। শ্রীমাকে অসহায় অবস্থায় আয়ত্তে পাইয়া এবং তাহাকে অকথ্য মানসিক যন্ত্রণা দিয়া এই পত্রের পাঠ লেখান হইয়াছিল। এ কার্য যাহারা করিয়াছে সেই দুষ্কৃতকারীদের কথা ভাবিতেও তাহাদের প্রতি ঘৃণায় সমস্ত দেহে জ্বালা ধরিয়া যায়।

শ্রীমার এই পত্রখানির যে কোন গুরুত্বই নাই তাহা ট্রাষ্টীদের গত ৫ই আগষ্ট তারিখে গৃহীত প্রস্তাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রস্তাবে শ্রীমার শিষ্যগণকে বঞ্চিত করিবার প্রয়াসে তাঁহারা দেবোত্তর পত্রের ১৯ ধারার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই ব্যাখ্যা যে ধোপে টিকিবে না তাহা বুঝিয়া উহাকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে

শ্রীমার পত্রখানিও প্রস্তাবে অঙ্গীভূত করিয়াছেন। স্পষ্টই দেখা যায় যে ট্রাষ্টীগণ তাহাদের কৃত ব্যাখ্যা বা শ্রীমার চিঠি কোনটির উপরই আস্তা স্থাপন করিতে না পারিয়া দুইখানি ভাঙ্গা নৌকার সাহায্যে একখানি নির্ভরযোগ্য নৌকার কাজ সারিতে চাহিয়াছেন। এই তুরুপের তাস 'শ্রীমার পত্রখানি' আমার ২৩-৬-৬৩ তারিখের পত্র পাইয়া ভয়ে দশ বৎসর বাদে সাফাই গাহিবার জন্য বাহির করা হইয়াছে এবং ট্রাষ্টীরা এই পত্রখানি দেখিয়াই ঘায়েল হইলেন—উহার পেছনের ধিক্কারজনক ইতিহাসের কথা তলাইয়া দেখিলেন না। যাহারা হালে ট্রাষ্টী হইয়াছেন, তাহারাও একটু ভাবিয়া দেখিলেন না যে ১৯৫৩ সালের চিঠি ১৯৫৪ সালের ট্রাষ্ট-বোর্ডের মিটিং-এ কেন আলোচনা হইল না, যদিও চিঠির স্বাক্ষর-কারিণী তখন বোর্ডের সভানেত্রী ছিলেন এবং চিঠিখানি ট্রাষ্টীদের প্রত্যেকের নামে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা। যিনি বা যাহারা এই চিঠিখানি আত্মসাৎ করিয়া বিশ্বাসভঙ্গের কার্য করিয়াছেন তাঁহারা কি বিশ্বাস ভাজন ট্রাষ্টী থাকিবার উপযুক্ত? দুঃখ হয়, যে ট্রাষ্টীদের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীঠাকুর তাঁহার বুকজোড়া ধন মঠকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়া মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন সেই ট্রাষ্টীরাই চিঠিখানির স্বরূপ সম্বন্ধে এবং ইহার পেছনে যে কলঙ্কময় ইতিহাস রহিয়াছে এবং সর্বোপরি মঠকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিতে তৎপর হইয়া কতদিন ধরিয়া যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হইয়াছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর করুন আপনারা সকলেই যে এই পাপ অনুষ্ঠানের জ্ঞানতঃ অংশীদার নহেন আমাদের এই ধারণা যেন সত্য হয়। জানিত অংশীদার না হইয়াও আপনারা যে আপনাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে অপরাগ হইয়াছেন, ইহাতে আমরা শংকিত হইয়াছি।

আপনাদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে যে দ্বিতীয় অস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা শ্রীমা (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের) সাধন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীদরবেশজীর তথাকথিত উক্তি। যাহারা স্বার্থসিদ্ধির মতলবে শ্রীমাকে দিয়া পূর্বালোচিত পত্রটি জবরদস্তি করিয়া লেখাইতে পারেন, তাহারা যে একই উদ্দেশ্য শ্রীঠাকুরের উক্তি বলিয়া একটি ডাহা মিথ্যা কথা প্রচার করিতে পেছপাও হইবে না, তাহা আর আলোচনা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তথাপি আপনারা যখন সাময়িকভাবেও এই কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, তাই এই ব্যাপারটা একটু আলোচনা করা দরকার। যাহারা দরবেশজীকে জানেন তাহারা স্বীকার করিবেন যে তিনি বাক্যে ও চিন্তায় গোঁসাইজীর অনুগামী ছিলেন। তিনি এমন কোন কথাই বলিতে পারেন না, যাহা গোঁসাইজীর উক্তির বিরোধী হয়। বিভিন্ন প্রকার গুরু সম্বন্ধে গোঁসাইজীর বক্তব্য ও অনুশাসন শ্রীশ্রীসদগুরু সঙ্গের ২৫৪-২৬৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অন্য সকল প্রকার গুরু ও তাঁহাদের দীক্ষা হইতে সদগুরু সাধনকে সম্পূর্ণ আলাদা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সদগুরু সম্বন্ধে গোঁসাইজীর উক্তি—সদগুরুর নিকট দীক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। সেখানে কোন কালাকাল, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই। তাহা সম্পূর্ণ কৃপা সাপেক্ষ। আচার্য গুরুর দীক্ষা ও সদগুরু সাধন একান্ত নহে। শ্রীমা সদগুরু সাধন প্রদান করিয়াছেন, তাহার দেহ স্ত্রী দেহ কি পুরুষ দেহ সে আলোচনা বা যোগ্যতার প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। স্ত্রীগুরু সম্বন্ধে গোঁসাইজীর উক্তি আগাগোড়া না পড়িয়া আপনাদের মত অনেকেই বিভ্রান্ত হইতেছেন। যাঁহারা শ্রীমাকে বিশ্বাস করিতে ক্লেশ বোধ করেন, তাহাদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে, দেহে থাকিতে শ্রীঠাকুর দেবী শান্তিসুধার প্রদত্ত সাধনকে গোঁসাইজীর সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তত্ত্বত যে দেহে সদগুরু সাধন

দেবার অধিকার জন্মে, উহা স্ত্রী দেহ কি পুরুষ দেহ তাহা বিচারের অতীত। 'মন্দিরে' প্রকাশিত শ্রীদরবেশজীর লিখিত একটি প্রবন্ধে প্রকাশ যে, শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর শেষ জীবনে শ্রীদেহে লিংগের অস্তিত্ব ছিল না—যোনিবৎ একটি চিহ্ন মাত্র ছিল। যাহারা শরীর বিছার পুঁজি লইয়া সদগুরু বুঝিতে চান তাহারা গোঁসাইজীকে কি বলিবেন? কাজেই ঠাকুর বলিয়াছেন বলিয়া যিনি শ্রীমা ও তাঁহার সাধন সম্বন্ধে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেন, তাহা যে আদৌ শ্রীঠাকুরের উক্তি হইতে পারে না, প্রচারকারীর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যাহারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির মতলবে শ্রীমায়ের সম্বন্ধে এইরূপ গর্হিত প্রচারে মাতিয়াছেন, তাহাদের বিন্দুমাত্র সততা থাকিলে শ্রীমার দেহে থাকা অবস্থায় তাঁহার প্রদত্ত সাধনকে অশাস্ত্রীয় ও শ্রীঠাকুরের অননুমোদিত জানিয়াও তাঁহারা মা'কে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই কেন? শ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর অত্যন্ত হীন মনোবৃত্তি লইয়া তাঁহারা এইরূপ রচিত ও কল্পিত কাহিনী দ্বারা অত্যন্ত চতুরভাবে গোপনে গোপনে নূতন নির্বাচিত ট্রাষ্টীদের এবং সরল বিশ্বাসী গুরুভ্রাতাদের মন বিষাইয়া দিয়া নিজেদের অসদুদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেছে। শ্রীঠাকুরের কৃপায় তাহাদের এই হেয় ও অসংলগ্ন আচরণের মুখোশ ক্রমশঃ খুলিয়া যাইতেছে। এই অসৎ সঙ্গ হইতে পঞ্চায়েত সভা ও মঠকে মুক্ত করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই।

(কুম্ভমেলায় সাধুদের সভায় গোঁসাইজীকে নিয়ে আলোচনা এবং পরে তাঁহাকে প্রভূত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করার যে কাহিনী আমরা সদগুরু সঙ্গে জানিতে পারি, মায়ের শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে কাশীর মঠে আলোচনা ও শ্রীবিমলেন্দু সেনগুপ্ত প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের বিচার প্রায় সমগোত্রীয়। শুধু এই নয়, এই ঘটনার মীমাংসা করতে গিয়ে কাশীর মঠ এবং কোন কোন গুরুভ্রাতার

মতিভ্রম বিষয়েও অনেক কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। দরবেশজীর তিরোধানের পর থেকে মঠে যত জঞ্জাল জমা হয়েছিল মা'র প্রতি অবিচারের সংশোধন করতে গিয়ে তাও দূর হয়ে গেল।) একটু অবান্তর হলেও পত্রখানি পুরোই তুলে দিলাম—

'মঠ ও মঠের সম্পত্তি লইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থের জাল যে কত দীর্ঘদিন ধরিয়া নিপুণভাবে বিস্তার করা হইয়াছে, এবার তাহাই আপনাদের গোচরে আনিব। শ্রীঠাকুর দেহত্যাগ করার পর দীর্ঘদিন মঠে কোন মহান্ত ছিলেন না। সেই সময়ে মঠে বৎসরের পর বৎসর নিত্য সেবার খাতে ঘাটতি হইয়াছে। হিসাবপত্রের বহু খাতা লোপাট হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। মঠ সংক্রান্ত বহু দলিল এবং শ্রীঠাকুর লিখিত নির্দেশ, শ্রীমার দশ বৎসর পরে প্রকাশিত পত্রটির মত কাহার ঝুলিতে আবদ্ধ রহিয়াছে কে জানে? শ্রীঠাকুরের দেহ-ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে লিখিত সীলমোহর করা পত্রখানা কী উদ্দেশ্যে গায়েব করা হইয়াছে, ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? উহাতে কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপন্থি নির্দেশ ছিল বলিয়াই বিশ্বাস করি। মহান্ত নির্বাচনের পূর্ব সময়ের মঠের অর্থাদি এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি সম্বন্ধে একটি তদন্ত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। শুনিয়াছি আপনারা ট্রাষ্ট বোর্ডের মিটিং-এ কাহারও নিকটে আর কোনও লুকান চিঠি নাই এইরূপ declaration চাহিয়াছেন। উহা পাইয়াছেন কিনা জানি না, পাইলেও তাহাতে আর বিশ্বাস করিয়া পুনরায় আর প্রবঞ্চিত হইবেন না।

মঠের অর্থাদির অসদ্ব্যবহার ছাড়াও মঠবাসিদের সম্বন্ধে অনেকদিন ধরিয়া নানা সূত্রে গোপনে গোপনে কুৎসা প্রচার করা হইতেছিল। তখন মঠে মহান্ত কেহ ছিলেন না। শ্রীমা এবং মঠবাসিগণ অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে অনেক দৌরাত্ম্য সহিতেছিলেন।

ট্রাষ্টীগণ সকলেই মঠ হইতে দূরে থাকেন। উৎসবের সময় ছাড়া মঠে আসিবার অবকাশ হয় না। কাজেই এই একতরফা কুৎসা রটনার বলি হইলেন সাধু মঠবাসিগণ। এমনকি মঠে মহান্ত আসিবার পরেও মঠবাসিগণের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর বিরাম হইল না। মঠের আয় অকুলান হইলেও আপনাদের কেহ কেহ প্রায় মঠ হইতে তাহাদের পরিবারবর্গের আহার্য সংগ্রহ করিতেন। কোন ট্রাষ্টীর লিখিত আপত্তির ফলে মঠ হইতে এই বরাদ্দ খাদ্য লইতে না পারিয়া ইদানীং অনেকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন এবং আশ্চর্যের কথা, আপনাদেরই আবার কেহ কেহ মঠের সামান্য আয়োজনের উপর এই অন্যায় ভাগ বসানোর স্বপক্ষে লজ্জাকর তদ্‌বির করিতেও পেছপা হইলেন না। মহান্ত আসিবার পর স্বার্থসিদ্ধির নানা প্রতিবন্ধক হওয়াতে হালে মোহান্তজীর উপরেও সেই বিকৃত কুৎসা রটানোর গোপন অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। অত্যন্ত গোপনে কোন কোন দূরদেশাগত গুরুভাইকে কোন বাড়ীতে বা নির্জনে লইয়া গিয়া আপনাদের কেহ কেহ মহান্তজী সম্বন্ধে নানা কুৎসিত ইংগিত কানে ঢালিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আপনারা অযথা রটনা করিতেছেন যে মঠের দ্রব্য মঠবাসিগণ চুরি করিয়া থাকেন এবং মহান্তজী সেই চুরির উৎসাহদাতা। শুধু তাহাই নহে, মহান্তজীর বাহিরের স্ত্রীলোক লইয়া মঠ আপত্তিকর আচরণের মিথ্যা কাহিনী রটনা করিতেও আপনাদের কেহ কেহ তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন।

আমরা জানি যে, মহান্তজী আসিবার পর মঠের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে—তার কারণ পূর্বে মঠের অভিভাবকস্থানীয়দের জন্য মঠ তহবিল হইতে যে খরচা হইত তাহা ক্রমশ বন্ধ হইয়াছে। যতদিন মহান্ত ছিলেন না, এতদিন মঠে যাহারা যথেচ্ছাচারের অবিমিশ্র সুযোগ পাইত, তাহাদের সে সুযোগ আর নাই। মহান্ত

বর্তমানে কোন ট্রাষ্টীরই এককভাবে মঠের ব্যাপারে খবরদারি করার কোন অধিকার নাই। তথাপি নিয়ত মঠের দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আপনারা মহান্তজীর জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। ভয় দেখাইয়া, কটু কথা বলিয়া, গায়ে-পড়া ঝগড়ার সৃষ্টি করিয়াও মহান্তজীকে নিজের কুক্ষিগত করিতে না পারিয়া, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তাহাকে যে হীন আক্রমণ করিয়াছেন, আপনারা হঠাৎ দু এক দিনের জন্য মঠে আসিয়া সেই আক্রমণকারীর হাতের ক্রীড়নক হইয়া নিজেরাও মহান্তজীর সম্বন্ধে তাঁহার অগোচরে নানা আপত্তিকর আলোচনায় যোগ দিয়াছেন।

মহান্তজীকে সরাইতে পারিলে এবং শ্রীঠাকুরের সময় হইতে যেসব শ্রদ্ধাভাজন গুরুভাই-ভগিনী মঠে আছেন তাহাদের বিতাড়িত করিতে পারিলে কাহার যে মঠে যথেচ্ছাচার ও মঠের সম্পত্তি উপভোগ করিবার মহা সুযোগ ঘটে তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। একটি সন্ন্যাসী গুরু ভাইকে কয়েক বৎসর আগে মঠ হইতে নির্মম ভাবে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই একই চক্রান্তে এই বৎসর জন্মোৎসবের সময় আপনারা ট্রাষ্টবোর্ড অন্য একটি মঠবাসিনীকে বহিষ্কার করিতে তৎপর হইয়াছিলেন। যাহার প্ররোচনায় আপনারা এইরূপ করিতে যাইতেছেন তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে কি বিন্দুমাত্র চিন্তা কখনো করিয়াছেন? শ্রীঠাকুর যাহাদের সন্ন্যাস ও কৌমার্য ব্রত দিয়া মঠে আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের Criminal আখ্যা দিয়া আপনারা শ্রীঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন। মঠবাসিগণ সব খারাপ লোক, আর তাহাদের কুৎসা রটনাকারিগণ সব ধৌত তুলসীপত্র—এই আজগুবী ব্যাপারটিতেও আপনাদের টনক নড়ে নাই। পরনিন্দায় মুগ্ধ হইয়া আপনারা প্রত্যেক অপকর্মে মন্ত্রণাদাতার পক্ষে সায় দিয়া যাইতেছেন। আপনারা এই গভীর ষড়যন্ত্রের নির্বাক ও

নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া এবং কখনও কখনও দুষ্কার্যের ইন্ধন যোগাইয়া আপনাদিগের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

বিশ্বাসের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তিগণ আপনাদের উদ্দেশ্য করিয়া লেখা শ্রীমা'র পত্র দশ বৎসর গোপন করিতে পারে এবং পরে নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য উহা প্রকাশ করিয়া আপনাদিগকে সকলের নিকট হাস্যাস্পদ ও লাঞ্ছিত করিতে পারে, যাহারা ঠাকুরের নিকট মঠে আশ্রয় পাইবার অধিকার পাইয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে এবং মহান্তজীর সম্বন্ধেও যাহারা কল্পিত কুৎসা প্রচার করিয়া মঠের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়া কলুষিত করিতে পারে—এমন লোকদের মঠের পঞ্চায়েত সভা বা কোন সংস্রবে রাখিলে সে মঠের আর কোন মঠত্ব থাকিতে পারে না। এ জাতীয় ব্যক্তির সাহচর্য যে-কোন মানুষের কাছেই গ্লানিকর। ধর্মার্থীদের কাছে তাহা অসৎসঙ্গের মতোই সর্বথা পরিত্যজ্য। ধর্মার্থী হইয়া আপনারা যাহারা মঠের আশ্রয় লইয়াছেন এবং ট্রাষ্টী হিসাবে মঠের কল্যাণ সাধনের বিশেষ দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং নিজ নিজ বৈষয়িক এবং সামাজিক জীবনে যাঁহারা আপনারা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের পক্ষে এই নীতি-জ্ঞানহীন সংসর্গ অত্যন্ত অগৌরবের এবং নিতান্ত অপমানকর। কাশীতে যখন ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সহিত আলাপ করিয়াছি তখন সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই জাতীয় অসৎ লোকের সংগে এক সাথে কাজ করা আপনারা অকর্তব্য বিবেচনা করেন। অথচ মঠ ও পঞ্চায়েত সভাকে কলুষমুক্ত করিবার কোন ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত করিলেন না। কিম্বা ব্যক্তিগত ভাবে পঞ্চায়েত সভা হইতে পদত্যাগ করিয়া আপনাদের বাক্যের ও কার্যের সমন্বয় করিলেন না। আমরা কি মনে করিব যে আপনারা ট্রাষ্টী থাকিবার গৌরব এবং সেই জন্য প্রাপ্য সুখ

সুবিধা পাইতে যতটা তৎপর, মঠের মঙ্গল ও ধর্মরক্ষার ব্যবস্থার জন্য যেটুকু মনোযোগ ও ক্লেশ স্বীকার করা দরকার, তা করিতে পরাঙ্মুখ? শুনি আপনাদের কেহ কেহ নাকি পদত্যাগ পত্র লিখিয়াও ফেলিয়াছেন। কিন্তু কই একখানিও তো এ যাবত দাখিল হয় নাই। আপনাদের আচরণ রহস্যময়।

আপনাদের দুঃখ বুঝি। কেহ শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়া ট্রাষ্টী হিসাবে কোন কাজ করিতে, এমনকি চিন্তা করিতেও অসমর্থ হইয়াও সুখসুবিধা এবং খাতিরের মোহে 'ঠাকুর নিয়োগ করিয়াছেন' এই যুক্তিতে পদ ছাড়িতে পারেন না। কেহ বা পদ যোগাড় করিতে যে অর্থব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন সেই মায়ায় পদ আকড়াইয়া আছেন। কাহারও কাহারও তো মঠকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা। তথাপি আপনারা যে ধর্মলাভের আশায় দরবেশজী ও মঠের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা যদি একবার স্মরণ করেন এবং শ্রীঠাকুরের দিকে একবার তাকাইতে পারেন, তবে অনায়াসেই এই দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন। একদা ঠাকুরের বিশ্বাস অর্জন করিয়াও যাহারা উৎসন্নের পথে চলিয়াছেন, তাহাদের চরিত্রের পরিবর্তন হইবে এই আশার বিলাসিতা ত্যাগ করুন। বরং মুখোশধারীদের মুখোশ যতই খুলিতে থাকিবে ততই সে মরিয়া হইয়া মঠের সর্বনাশের রাস্তা আরও সুগম করিতে চেষ্টা করিবে। তাই বলি, সাধু সাবধান! আর বেশি বিলম্ব করিয়া ফেলিলে মহান্তজী মঠ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। মঠবাসিগণও অতিষ্ঠ হইয়া রাস্তায় বাহির হইবেন।

আমরা দীর্ঘদিন ধরিয়া মঠের ব্যাপারে আপনাদের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া বড়ই ঠকিয়াছি। গুরুভাই বলিয়া দুষ্কৃতকারী অনেক অনাচার ভ্রষ্টাচার নীরবে সহ্য করিয়াছি। কাশী হইতে ফিরিয়া শ্রীঠাকুরের ১৯৮৭ অব্দের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের চিঠিতে হঠাৎ

যখন পড়িলাম যে, 'গুরুভাই অজুহাতে ন্যায় বিচার না করিলে গুরুকে অপমান করা হয়' তখন আমার আর কোন দ্বিধাই রহিল না। শ্রীগুরুর অনেক অপমানই ওই অজুহাতে করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু আর নহে। শ্রীমাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঠাকুরকে যাঁহারা অসম্মান করিয়াছেন ও করিতেছেন, গুরু ভাই বলিয়া তাহাদের আর প্রশ্রয় দিব না। ইহাদের ভণ্ডামী ও অসাধুতার মুখোশ খুলিয়া দেবার কাজ ঠাকুরসেবার মতোই ব্রত হিসাবে পালন করিয়া যাইব।

মনে রাখিবেন যে, শ্রীমা'র শিষ্যদের নাম গণতালিকাভুক্ত করার কাজ যখন দীর্ঘ বার বৎসর করা সম্ভব হয় নাই, তাহা আরও কিছুদিন পিছাইয়া দিলে মারাত্মক কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু এই উপলক্ষে মঠের সর্বনাশকামী স্বার্থান্বেষীদের যে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং তাহাদের চিহ্নিত করিতে পারিয়াছি, ইহা শ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপা। মঠকে বিপন্মুক্ত করার এই মহা সুযোগ হারাইলে অপূরণীয় ক্ষতি হইবে।

এখনও আপনারা হয়ত মঠকে অক্ষতভাবে রক্ষা করিতে পারেন। এখনও তৎপর না হইলে শ্রীঠাকুরের আশঙ্কাই হয়ত সত্য হইয়া দাঁড়াইবে। মঠ আর মঠ থাকিবে না। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। শ্রীঠাকুর আমাদের সকলকে সুমতি ও সুবুদ্ধি প্রদান করুন—এই প্রার্থনা করিতেছি।'

হে ঠাকুর, তব দিব্য আসনে,
অসুর গরবে বসে যেই খনে,
নীরবে তাহারে নামাও হে টেনে
সে লীলা হেরিতে পাই—পাই
পাই গো পাই।

সদগুরু মা—২

যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।
অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারোন্নো বিমুচ্যতে॥
—শ্রীপাদ জীব গোস্বামী।

আনন্দময়ী মা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠে এসেছেন। এসেই দোতলায় শ্রীমায়ের ঘরে। শ্রীমায়ের কোলে মুখ গুজে মা আনন্দময়ী বলছেন, মা, মা আমার, শ্রীমা বলছেন, 'জয়গুরু, জয়গুরু'। যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। মা আনন্দময়ী বললেন, মা আমি বিন্ধ্যাচল যাচ্ছি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর। শ্রীমা বললেন সাম্‌নে গ্রহণ, তুমি গ্রহণে কাশীতে গঙ্গাস্নান করবে না? তোমার যা ইচ্ছে মা, আমি গ্রহণে ঠিক গঙ্গা স্নান করবো। গ্রহণের দিন মঠবাসিনী দিদিরা গঙ্গা স্নানের পর আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে গিয়েছেন। মা তখন স্নান সেরে খোলা চুলে প্রসাদ পাচ্ছেন। ওগো, তোমরা আমার মা'কে বলো আমি কিন্তু গ্রহণে গঙ্গাস্নান করেছি।

মীরাবাঈ শ্রীবৃন্দাবনে এসেছেন। কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, কোথা আমার প্রাণ সখা। শুনেছেন বৃন্দাবনে এক সাধু আছেন, তিনি নিয়ত নিত্যলীলা দর্শন করেন। সাধু দেখতে যাবেন মীরাবাঈ। লোক পাঠিয়েছেন সাধুর কাছে। সাধু বললেন সে কি করে হবে—আমি যে স্ত্রীলোক দর্শন করি না। বিস্মিতা হলেন মীরাবাঈ। আমি তো জান্‌তাম একজনই মাত্র পুরুষ আছেন শ্রীবৃন্দাবনে। সাধুর সম্বিত ফিরল। ওরা হাসে, জানে

না তাই হাসে, আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি। তাই জানি, তাই মানি।

১৩৫৫ সাল গ্রীষ্মকাল সুরু হয়েছে। ৺অক্ষয় সাহার বাড়ী, ৩, বৈষ্ণব শেঠ ষ্ট্রীটে মা এসেছেন। দাদাদের গুরু মা। বিশু, শিশির আর শ্যামল তিন ভাই দাদা নন্তুর সাথে বিকেলে মা'কে দেখতে গেল। কত লোক, কত ফুল, মা বসে আছেন। সামনে কম্বলের আসনে বসল ওরা। লীচু, ছানা মিস্ত্রির বৈকালী প্রসাদ পেলো। কীর্তনান্তে বাড়ী ফেরা। জয় নবঘন বিজলী বরন, তাপিত তৃষিত ধরা, কর ধারা বরিষণ। সাত বছরের শ্যামল প্রত্যহ মা'র কাছে যায়, মা'র সামনে হাঁঠু গেড়ে বসে আর বলে মা আমাকে সাধন দাও। তুমি বড় হও, সাধন হবে। না মা এখনি দাও। সাধন আমার চাই-ই। মা হাসেন, শ্যামলও নাছোড়বান্দা। রাজি হলেন মা। অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে বেলা সাড়ে ন'টায় শ্যামল, শিশির, বিশু সাধন পেল। ৭, ১৪ আর ১৯ বছর বয়স তখন ওদের। সুনীতিদিদির ছেলের বউ চিনুর সাধন ঐ আসরে। আরও অনেকে ছিলেন। বড় হয়ে শ্যামল বলেছে, তখন আমার মনে হত সাধন পেতেই হবে। যেমন করে হ'ক সাধন আমার চাই-ই-চাই। অযাচকে যেচে দিলে রাতুল চরণ, মাতারূপে তুমি ওগো গুরু হে আমার।

ধানবাদের কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কাশী এসেছেন—সাধন নেবেন বলে। সাধন প্রার্থনাও করলেন মা'র কাছে। মা কিছু বললেন না। ত্রিলোচনদা পরে জানিয়ে দিলেন—না সাধন হবে না। অসুস্থ শরীরে মা আর সাধন দেবেন না। রাসবিহারী কবিরাজের ছেলে শক্তিপদ সেইদিনই কাশী ছেড়ে চলে আসতে চাইলেন। নানা বাজে ঝামেলায় আটকে গেলেন আর একটা দিন।

কাশীর মঠে সে সময় নতুন মহান্তের অভিষেক হচ্ছে। অসীমানন্দ সরস্বতী, ভগবানদাসজী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য সাধক ভক্তেরা তখন কাশীতে। মঙ্গলদাসজী তো আছেনই। ভোরবেলা মঙ্গলদাসজী শক্তিপদকে ডেকে বললেন—কাল তোমার সাধন হবে, মা অনুমতি দিয়েছেন।

বিকেলবেলায় শক্তিদা পাড়ে-ধর্মশালায় গিয়েছেন—অসীমানন্দ ডেকে সাধন দিতে চাইলেন। 'শক্তি সাধন নেবে, এস তোমাকে আমি দীক্ষা দিই।' শক্তিদা মহা ফাঁপরে পড়লেন। ভগবানদাসজীর পরামর্শ চাইলেন। ভগবানদা, অসীমানন্দজীকে সত্য কথা জানাতে বুদ্ধি দিলেন। শক্তিদা অসীমানন্দকে জানালেন, 'দেখুন আমি সাধন প্রার্থী ছিলাম। সাধন হবে না শুনে কালকে চলেও যাচ্ছিলাম ধানবাদ। যাওয়া হল না। আজ ভোরবেলা মঙ্গলদা বললেন, মা সাধন দিতে রাজি হয়েছেন।' সব শুনে অসীমানন্দজী মহা খুশী। সময় হলে চিহ্নিতেরা সদগুরু সাধন অবশ্যই পাবেন।

দিনাজপুরের বিমলেন্দুনারায়ণ সিন্‌হা, তাঁর স্ত্রী নিলীমা সিন্‌হা, ছোট বেলায় হরিদাস বসুর, সদগুরু লীলার বই পড়ে গোঁসাইজীর কথা জানতে পান। সাধন যদি নিতে হয় তো গোঁসাই সাধন। দিন চলে যায়—সংসারের ঝামেলায় বিস্মরণ। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল নিলীমাদির। আকাশ ভরে তখন কান্না ঝরছে। ডেকে দাও, ডেকে দাও বাছারে আমার, একা আমি পারি না থাকিতে। কাঁদছ কেন যার দান তিনিই নিয়েছেন। বিভুর আঁখির তরে ফুটিয়া ধরায়, সৌন্দর্যের অর্ঘ্য ঝরে চির সুন্দরের পায়। ছোট বোন, ভগিনীপতি, মা সবাই বললো চল আমরা কাশী যাই, কাশী থেকে বৃন্দাবন। এঁরা রাজপুত—ছোট-বোনের বিয়ে হয়েছে পাইকপাড়া রাজাদের বাড়ী। লালাবাবুর বংশধর। বৃন্দাবনের টান এদের রক্তে। যদি বিষয়েতে সুখ হত

রে, তবে লালাজী ফকির হত না, সদায় হরি বোল। কাশী। শ্রীশ্রীহরিহর বাবাকে দেখতে গেল ওরা। মনে ধরে গেল। না তোমরা বৃন্দাবনে যাও—আমরা কাশীতে থাকি। গঙ্গাস্নান করি. পাঠ শুনি, সাধু দর্শন করি। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের সন্ধানও পেল তারা। হরিদাস দাসবাবুর বিজয়কৃষ্ণ। চল মঠে যাই। মঠে তাঁর শিষ্যও আছেন একজন শুনেছি। বিজয়কৃষ্ণ কোথায় তোরা বল্ বল্রে. তোরা বল্রে। চল্রে শরীর। মঠে এসে শ্রীমূর্তিত্রয় দর্শন করে নিলীমাদির মনে সে কি আনন্দ। আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে। বিমলেন্দুনারায়ণ রোজ মঠে যেতে সুরু করল। আরে এ যে গোবিন্দ দত্ত মশাই? গোবিন্দদাদা দিনাজপুরে রাজষ্টেটে কাজ করতেন যে। গোবিন্দদা নারায়ণদাকে শ্রীশ্রীদরবেশজীর কাছে নিয়ে যান, পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছ'দিন পরে নিলীমা দিও দরবেশজীকে দর্শন করলো। পা ছুঁয়ে প্রণামও করলেন। বলি বলি করেও দরবেশজীর কাছে সাধন প্রার্থনা করা হল না।

তিন বছর কেটে গেল, দিদির কোল জুড়ে তখন কাশীনাথ। ইতিমধ্যে দরবেশজী দেহ রেখেছেন, দেশ বিভাগ হয়েছে। দিনাজপুরের পাট চুকিয়ে ওরা বৈদ্যনাথধামে উঠেছেন। বৈশাখের মাঝামাঝি চন্দ্রগ্রহণ ছিল। মধ্যরাত্রে গ্রহণ লাগবে। কিন্তু গ্রহণ দেখার আব্দার করছে। মা বলছে ঘুমোও তোমায় তুলে গ্রহণ দেখাব। গ্রহণের গল্প বলতে বলতে মা-ছেলে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল। দিদি স্বপ্ন দেখল যেন নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাট। কীর্তনের ধ্বনি ভেসে আসছে। একটু পরেই একখানা নৌকো করে গোঁসাইজী এলেন। সাথে দরবেশজীও রয়েছেন। আরও যেন কারা। গোঁসাইজী বললেন, এস মা উঠে এস। কি করে উঠবেন ভাবছেন দিদি। গোঁসাইজী ওঁকে হাত, বাড়িয়ে তুলে

নিলেন। নৌকোয় দেখেন অনেকে ভোগের জন্য ফল ছাড়াচ্ছেন। গোঁসাইজী দিদিকেও কাজ করতে বললেন। তার পর বললেন ছেলেকে গ্রহণ দেখাবে বলেছ—গ্রহণ দেখাও। ও যে ঘুমোচ্ছে। তোমার কথায় বিশ্বাস করে ঘুমোচ্ছে, তুলে গ্রহণ দেখাও। কথা দিয়েছ যে।

দিদির ঘুম ভেঙে যায়। গ্রহণও তখনই ঠিক লেগেছে।

দেওঘর থেকে বেড়াতে কাশী এসেছেন আবার। মঠে যান, দর্শন করেন। কারুর সাথে আলাপ নেই। ধারণা দরবেশজী চিরকুমার। দেওঘরে ফিরলেন। কিছুদিন পরে গোবিন্দদাদার চিঠিতে জানতে পারেন শ্রীমা খুবই অসুস্থ, কখন কি হয় বলা যায় না, মঠের সকলে তাই খুব ব্যস্ত। মা আছেন নাকি মঠে, কই আমরা তো জানতাম না। মা'কে দর্শন করতে হবে। মোটরে ছুটে এলেন ওরা কাশীতে। মা তখন ভালোর দিকে। সরস্বতী পুজোর দিন মাকে প্রথম দর্শন করেন। মা বললেন, মঠে এলেই আমার কাছে আসবে। পথ তো চিনে গেছ।

মা'র কাছে আসেন দিদি, মা'কে :দেখেন গম বাচ্ছেন, প্রদীপের সলতে তৈরী করছেন। দিদি মা'র কাছে বসে থাকেন, মা'র জামায় বোতাম লাগিয়ে দেন। এটা ওটা করেন। প্রথম দিনেই দিদির কপালে সিঁদুর পরাতে পরাতে মা বলেছিলেন—তোমার দীক্ষা হয়েছে? দীক্ষা নাওনি কেন? তোমার কপালে তো দেখছি দীক্ষা পাবার সমস্ত লক্ষণই ফুটে উঠেছে।' দীক্ষা সম্বন্ধে আর কোন কথা হয়নি। দিদি মা'র সহচরী হয়ে উঠলেন। তোয়ালের ধার মুড়ে দিচ্ছেন, সেলাই করে দিচ্ছেন, মা'র জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করেন। প্রতিদিন গোঁসাই প্রণাম করে ছুটে মা'র কাছে যান।• প্রতিদিন মা গোঁসাই প্রসঙ্গ করেন, নিজের কথা দরবেশজীর কথা বলেন, হঠাৎ একদিন মা বললেন, 'তুই রোজ রোজ এখানে আসিস্ কেন।' দিদি

দেখলেন, মা গম্ভীরভাবে তাকে দেখছেন। দিদির ভয় করল না—তবে আবহাওয়া যে বদলে গেছে টের পেলেন। বললেন, মা কেন ছুটে আসি জানি না, তবে এইটুকু বুঝি এখানে এলে খুবই ভাল লাগে। মা আবার সাধারণ প্রসঙ্গে চলে এলেন।

'এই ঘটনার প্রায় ৮/১০ দিন পর সকাল ৮টা নাগাদ মঠে গেছি। মন্দিরে প্রণাম করে উপরে গেছি—দেখি মা বিছানায় বসে আছেন। আমি প্রণাম করতেই মা বললেন, ছাখ, তুই যদি সাধন চাস তাহলে তুই সাধন পাবি। তবে বাড়ীতে তোর স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। আমি শুনে আনন্দে আত্মহারা যাকে বলে। আমি তক্ষুনি চলে আসছিলাম, মা বললেন এখন বস। একটা কথা বলিনি—এই যে আমরা রোজ মায়ের কাছে যাই, মা রোজই আমাদের জন্য একটু প্রসাদ (বাল্যের), কিম্বা কিস্‌মিস্, কি এলাচদানা যাই হোক কিছু না কিছু দিতেন। মোট কথা শুধুমুখে কোনদিনই বাড়ী আসি নাই।

সেদিন বাড়ী ফিরে ওর কাছে বলাতে উনি বললেন, বাঃ বেশ লোক যা হোক। তুমি একা সাধন নেবে আর আমি নেব না? আমি বললাম, ঠিক আছে মা'কে বলবো তোমার কথা। সেদিনই বিকেলে মাকে বললাম মা, আমায় সাধনের অনুমতি দিয়েছেন আর বলেছেন উনি কি এই সাধন পেতে পারেন না, ওরও যে এই সাধন পাবার তীব্র ইচ্ছা।

মা শুনে বললেন, আমার কাছে সাধন কেন? আমি বললাম হ্যাঁ মা, মা শুনে চুপ করে থাকলেন। আমি বাড়ী এসে ওঁকে সব বলায় উনি বললেন, তুমি মা'কে বলবে আমি তাঁর চরণ দর্শন করতে চাই এবং সাধন ভিক্ষাও করব, যদি দয়া করে দর্শন দেন। মা ওঁকে তাঁর কাছে আসার অনুমতি দিলেন। উনি জোড় হাতে মায়ের চরণে প্রণাম করে সাধন ভিক্ষা করলেন। মা সেদিন কিছু বললেন না।

দিন দুই তিন পরে মা বললেন যে, সংক্রান্তির দিন তোদের সাধন

হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম সাধন নিতে কি কি লাগবে এবং আমরা কি কি করব। মা বললেন কিছুই লাগবে না, কেবল তোরা গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ কাপড়ে আসবি। আর কিছু না। আর সেদিন এইখানেই প্রসাদ পাবি।

এর মধ্যে কান্তোড় থেকে ত্রিলোচন চক্রবর্তি সাধন নিতে এসেছে। আবার ফিরে যাবে। মা সাধনের দিন শনিবার থেকে এগিয়ে বৃহস্পতিবার করে দিলেন। ২৭শে চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৫৭ সাল, পূজো শেষে বেলা ন'টায় মা ত্রিলোচনদা, নারায়ণদা এবং নিলীমা-দিকে প্রণালীমত সাধন দিলেন। সাধন বৈঠকে শ্যামলানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। চার পাঁচ বৎসর পরে শ্রীমান কাশীনাথও মা'র কাছে সাধন পায়।

নারায়ণদা একবার শাস্ত্র অধ্যয়ন স্থরু করেন। মা ডেকে বারণ করে দেন—বেদান্ত পড়বে না। একদিন সকালে কাশীনাথ খেলতে খেলতে মা'র কাছে গেছে। মা বললেন—কাশী তোর বাবাকে বেদান্ত পড়তে বারণ করলাম—সে আবার শুরু করেছে। কাশী বাড়ীতে এসে বলল সে কথা। দাদা জিজ্ঞেস করলেন, কখন বলেছে রে। এই তো সকালে আটটা ন'টা হবে। দাদা ঠিক সেই সময়টাতেই পুরনো নোটগুলি ঘাটছিলেন। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

১৩৫৭ থেকে মা, গ্রীষ্মকালে নিয়মিত কলকাতা আসতেন। উঠতেন প্যারীমোহন পোদ্দারমশাইর ১৭জে নলীন সরকার ষ্ট্রীটে। তখন সে এক আনন্দের দিন গিয়েছে। সারা গরমের ছুটিতেই সবাই বিকেলে মা'র কাছে আসত। দরবেশজী প্রসঙ্গ প্রণেতা সদানন্দ মিত্রের বাবা শশধর মিত্র সেতার বাজাতেন। কামাক্ষ্যা মজুমদার, ভুপতি বোস, কালাচাঁদ সাহা, নন্তরা কীর্তন করত। কোন কোন দিন রামনাম গান হত। হীরেন্দ্রনাথ রায় মা'র

চিঠি লিখে দিতেন। কোন কোন দিন বা নির্মলেন্দু সেন (বিশু)ও লিখত। নলীন সরকার ষ্ট্রীটের বাসায় নন্তুদার স্ত্রী, দীপ্তি সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনের স্ত্রী মঞ্জুশ্রী সেন এবং প্রভাতদার ছেলে মণ্টুর (ডাঃ প্রণবকুমার ভৌমিক) সাধন হয়। প্যারীদাদার স্ত্রী পূণ্যলক্ষ্মীদিদি দীর্ঘদিন মা'র কাছে থেকেছেন। দিদির কাছে শুনেছি মা চা বা পান খেতেন না। ঠাকুর দেহে থাকতে দু' একটা খেতেন। কুমড়ো পাতার ঝোল, বেগুন সিদ্ধ ও আম ভালবাসতেন।

মা খুব ভোরে উঠতেন। স্নান করতে এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় লাগত। স্নান সেরে পূজোয় বসতেন। পূজো শেষে বাল্য ভোগ দিতে ন'টা বেজে যেত। বসন্তদিদি বা সুনীতিদিদি পূজোর যোগাড় করে দিতেন। মা লোকজন খাওয়াতে ভালবাসতেন। ঠাকুরকেও ভাল ভাল ভোগ দিতেন। দিদিকে ডেকে বলতেন, আজ ঘি ভাত ভোগ দেওয়া হবে, আজ রাত্রে পায়েস ভোগ হবে। দিদি বলেন, 'ঠাকুর যখন কলকাতায় আসিতেন তখন আমার বাড়ী হয় নাই। ১৯৪৯ সন থেকে মা এই বাড়ীতেই উঠিতেন তখন হইতে শারীরিক, মানসিক বা আর্থিক কোন ঝামেলাতেই পড়ি নাই। না দাদা, মায়ের কাছে, কোন বিশেষ কিছুর জন্য প্রার্থনা করি নাই। না চাইতেই মা সকল সময় আশীর্বাদ করতেন।'

মা প্রতিদিন দিদিকে সিঁদূর পরিয়ে দিতেন, ভাল ভাল কাপড় পরতে বলতেন। মাঝে মাঝে কীর্তনের পর সকলে চলে গেলে দিদিদের সাথে গোঁসাই প্রসঙ্গ করতেন। গোঁসাইজীর জন্ম বৃত্তান্ত, সাধন রহস্য, প্রেম ভালবাসার কথা বলতেন। কখনও কখনও দরবেশজীর কথাও বলতেন। রসিকতা ইত্যাদি বসন্তদিদির সাথেই হ'ত। বসন্তদিদির কাজ পছন্দ না হলে বলতেন, 'সন্তু তোকে লাঠি দিয়ে পেটাব, যা—তোকে কিছুই করতে হবে না, আমার

মেয়ে সব করবে' আমার কিছুক্ষণ পরেই 'বসন্ত' 'বসন্ত' বলে ডাকতেন। নরোত্তমদাদা, কখনও বা শ্যামলানন্দজী বা যোগানন্দ দাদা মা'র সাথে আসতেন।

শ্রীমা দেহে থাকতেই তাঁর জন্মদিন শুরু হয়। জন্মতিথিতে কলকাতা থাকলে মহাধুমধামের সাথে জন্মদিন পালন করা হ'ত। প্যারীদাদার বাড়ীতে, বাহাদুরদের বাড়ীতে এবং অহীদার বাড়ীতে জন্মোৎসব করা হয়েছিল। মা'র দেহান্তে কাশীর মঠে নিয়মিত জন্মোৎসব পালন করা হয়। শ্রীমান শ্যামলেন্দুর উৎসাহে ১৯৬৮ সাল থেকে নন্তুদার বাড়ীতে এবং পরে জাফরপুর রোড, বারাকপুরের আশ্রমে অষ্টপ্রহর 'ভজ গুরু গৌরাঙ্গ রাধা গোবিন্দ ব্রহ্মনারায়ণ হরে কৃষ্ণ রাম' নামের সাথে শ্রীশ্রীমা'র জন্মদিন পালন করা হচ্ছে।

মা কলকাতা থেকে পুরী যেতেন কোন কোন বছর। ১৩৫৯ সালে ভুবনেশ্বর হয়ে পুরী যান। শান্তিদা (বাঙ্গুর এ্যাভিনিউর শ্রীশান্তিময় কুণ্ডু) মা'র চলনদার। ভুবনেশ্বরে শ্রীমুকুন্দলাল গাঙ্গুলী মহাশয়ের (মা'র দাদা) বাড়ীতে থাকবেন। দুপুরে মুকুন্দবাবুর বাড়ীতে পৌঁছলেন। রান্না করে খাবে সবাই। উনুনে মাছের আঁশ বেরোল। সর্বনাশ, কি হবে? শান্তি ভাবছেন আবার উনুন তৈরী করতে হবে, উনুন শুকোবে তারপর রান্না। আজ আর খাওয়াই হবে না দেখছি। মা'কে বলা হল আঁশের কথা। মা বললেন—হাত দিয়ে তুলে ফেলে দাও, গোবর দিয়ে লেপে রান্না কর গিয়ে। আগুনে সব শুদ্ধ হয়ে যাবে। শান্তিদা অবাক, এই মা'কে কিনা বলে শুচিবাই। শান্তিদাকে মা বললেন, শান্তি পথে দেখলাম তেঁতুল গাছে কচি তেঁতুল পাতা হয়েছে। নিয়ে আয়, দেখবি কেমন একটা জিনিস তৈরী করে দেব। তেঁতুল পাতার ঝোল খেলেন শান্তিদা। ফার্ষ্ট ক্লাস। আচ্ছা মা তুমি গোঁসাইজীকে দেখেছ—যেমন আমি তোমাকে দেখছি, রক্তমাংসের শরীর। না রে

অমন ভাবে দেখিনি, এ রকম কী আর দেখা যায়। তুমি তবে গোঁসাইজীকে দেখেছ? মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। মা'র পত্রলেখক এখন শান্তি। মঠ থেকে কোন এক বিশেষ ভোগ বা উৎসবের খবর এসেছে। মা আরও বিস্তারিত খবর চান। শান্তি লিখল—'ক'জন লোক প্রসাদ খাইয়াছে জানাইবেন'—শুনে মা'র সে কি হাসি। আরে বলদ, প্রসাদ কেউ খায় নাকি রে? প্রসাদ পায়, সেবা করে। মা পূজোর ঘরে, হঠাৎ ডাকলেন শান্তি, শান্তি? শান্তিদা ভয়ে ভয়ে ঢুকলেন। মা'র হাতে একখানা পুরনো পোষ্ট কার্ড। আসনের নীচে ছিল। ছাখ ছাখ, দাদা আমায় কি বলে ডাকতেন—ফুছকি। অনেক অনেকদিন আগেকার মাখনমামার চিঠি। ফুছকি—মা হাসছেন আর ছ'চোখে ধারায় জল পড়ছে। আজি এ গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উদল। আড়িয়াল। 'মাখনের বাড়ীতে আর একটি আশ্চর্য জীবের সন্ধান পাইলাম। সে মাখনের কনিষ্ঠা ভগিনী সরোজবালা।' 'আপনি তাহলে এখনও সাধন পান নাই, কি আশ্চর্য আপনি কেমন মানুষ?' সে আজিকে হল কতকাল তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল।

অনেক চিঠি আসে মা'র কাছে, অনেক রকমের চিঠি। সাধন প্রার্থনা, মঠের কথা, উৎসবের কথা। 'মা মেয়ের শরীর খারাপ শ্বশুর বাড়ী হইতে তাই আমার কাছে আনিয়াছি' ওরে শান্তি, ওকে কটা টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করত। মেয়ের সাধ দিতে হবে যে ওদের, এককালে কত ছিল ওদের, ঠাকুর যে এখন সবই নিয়ে নিয়েছেন রে।' সাধের টাকা, বিয়ের টাকা, কত শিষ্যশিষ্যাদের কত ভাবে সাহায্য করতেন মা।

আমাদের মধ্যে বর্ণাশ্রম ব্যাপারটা নিয়ে বেশ গোলমাল দেখা যায়। মঠেও শোনা যায় ও-দিদি আপনি কি জাত—ছুঁয়ে দিলেন যে। মূল পূজা এবং ভোগ নিবেদন জন্ম-ব্রাহ্মণ দিয়ে করানোই

নিয়ম। এ ছাড়া বর্ণাশ্রম সামাজিক নিয়ম। সদগুরু আশ্রিতদের মধ্যে বিয়ে-সাধি ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠান ব্যতীত জাতবিচার এবং ছোঁয়াছুয়ি থাকাটাই কুসংস্কার।

নীলিমাদি মঠে এসেছেন, মা সবে প্রসাদ পেয়ে উঠেছেন, বললেন, আমার হাতে জল দে। বসন্তদিদি কিছুতেই তা হতে দেবেন না। মা তুমি মুখ ধোওনি নীলিমাদি জল দেবেন কি—ও কি ব্রাহ্মণ? মা রেগে উঠলেন—আমি বলছি ও ব্রাহ্মণ—দে তুই জল, আমার হাতটা ধরে ধুইয়ে দে।

কাশীতে মা'র শেষ গোঁসাইজীর জন্মোৎসব। আবার নীলিমাদিকে ডেকে বললেন, আমার হাতটা রগড়ে ধুইয়ে দে। ঘর ভর্তি লোক—সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। ব্রাহ্মণবাড়ীর দিদিরা আপত্তিও করলেন কেউ কেউ। না, মা ঐ নীলিমার কাছেই হাত ধোবেন। মা'র মাথা খারাপ হয়েছে—তা না হলে মুখে এঁটো নিয়ে কায়স্থের হাতে জল নেয়—কায়স্থকে ছুঁতে দেয়।

হাত ধুয়ে উঠে মা বললেন—ওরে, ঐ ভাখ বাটিতে পায়েস রয়েছে, আমাকে খাইয়ে দে না। ঘর ভর্তি লোক নির্বাক। দে বলছি, আমাকে খাইয়ে দে। নীলিমাদিদি ভয়ে কাঁপছেন। দিদি আপনার অপরাধ হবে, মা ভালমন্দ বুঝতে পারেন না আজকাল। মা বর্ণাশ্রম ভাঙছেন। দেবেন না আপনি মায়ের মুখে পায়েস। ওরে দে আমাকে পায়েস খাইয়ে দে, তোর হাতে খাব, আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে। দিদি চামচি করে পায়েস মুখের কাছে নিচ্ছেন আবার ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন। যোগেশদাও ছিলেন সেখানে। মা যখন বলছেন, দিদি আপনি ভয় পাবেন না। দিদি মায়ের মুখে পায়েস দিলেন। মা মুখে নিলেন। খেলেনও একটু। মুখ ধুয়ে মুখবাস নিলেন। আপনি আচরী ধর্ম অপরে শেখায়।

তোমরা কি গোঁসাই নও, তোমরা কি গোঁসাই ছাড়া?

শান্তিদা বলেন দেখ ভাই, মা'র কাছে যখন ছিলাম তখন হাতে একটা পয়সা ছিল না। খাওয়া দাওয়া, যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া সকলই মায়ের দেওয়া। আর আজ যে এই সব দেখছ এও মায়েরই আশীর্বাদ।

মায়ের অশেষ মহিমা, অতুল গুণ-গরিমা
সেই মজিল যে না পেল, সে রূপের সীমা।
মধুর রূপের মাঝে কি যে আছে, এমন রূপ আর দেখি নাই।

মা'র ইহ-জীবনের শেষ উৎসব

ছিল না বাড়ী ছিল না ঘর, ছিল না দাস-দাসী,
ছিল না কোন বসনভূষা রতন রাশি রাশি,
ভোলার মত ভর্তা পেলে
কতই তোমার মেয়ে, ছেলে,
বাসের লাগি অলকাপুরী—মর্তে পেলে কাশী
ধনের রাজা কুবের তব দয়ার অভিলাষী।

মা এবার আশী বৎসরে পা দিলেন। মঠে গোঁসাইজী জন্মোৎসবে সকলকে ডেকে পাঠালেন—ক'দিন আর আছি আমার সঙ্গে উৎসব করে যা। ছেলে-মেয়েরা ছাড়া দীক্ষাপ্রার্থীও অনেকে। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠে সে এক অভিনব উৎসব। উৎসবের বিবরণী গুরুভ্রাতা সাধু যোগেশচন্দ্র ঘোষের লেখা—

"২০-৮-৬১ তারিখ হইতে ভক্তজনস্রোতপ্রবাহ সুরু হইল। মঠে নতুন প্রাণের সঞ্চার হইতে লাগিল। নূতন নূতন জনস্রোত দেখিয়া মঠস্থ সকলের প্রাণ পুলকে ভরিয়া উঠিল। ভাই মঙ্গল—অসুস্থ অবস্থায় এসেও উৎসবের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। মঠ আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমা এখন মরজগতে খুব কম থাকেন। সর্বদাই ধ্যানস্থ হইয়া ভগবানে যুক্ত হইয়া আনন্দধামে বিরাজিত হন। অনেককেই চিনতে পারেন্ না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে মায়ের চরণে নিবেদন জানালাম—'মা বৃষ্টি যেন না হয়। মা বললেন—"হবে না।" মায়ের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হল।

(মায়ের এই লোক না-চেনার ব্যাপারটা আবার বেশ দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। প্রথমত মা'র কি সত্যিই মাথা খারাপ হলো? (ওরা যে বলে), দ্বিতীয়ত, মা যাদের পছন্দ করেন না, তাদেরই চিনতে না পারার ভান করেন। অপছন্দ করার কারণ সাধন না করা, বিধিনিষেধ না মানা। আমি নিয়মিত সাধন করছি না, বিধিনিষেধ কখনো মেনেছি কখনো মানিনি। সুতরাং ভয়ে ভয়ে আছি। মা চিনতে না পারলে কষ্ট পাবো, আবার সবার সামনে উল্টোপাল্টা আমার কীর্তিকাহিনী বললেও মান থাকবে না।

২৪শে আগষ্ট ভোরবেলা পাঁচটা কি তারও আগে মা'র ঘরের জানলা খোলা দেখে ভেতরে চাইলাম, হাতে দাঁত মাজার ব্রাশ, দেখি মা বিছানার উপরে বসে। ঘরে আর কেউ নেই, বারান্দাতেও না। আলোও ফোটেনি তখন ভালভাবে। মা জিজ্ঞেস করলেন, "কে ওখানে?" আমি নাম বললাম। মা বললেন, "স্নান করে কীর্ত্তনে বস গিয়ে।" এক বাক্যে আমার দ্বিধা দূর হল। বুঝলাম মা'র সবকিছুই খেয়াল আছে—আট-দশদিনের প্রোগ্রাম, আজকেই শুধু সকালবেলা কীর্তন (মঙ্গল আরতি তখন হয়ে গেছে) দ্বিতীয়ত, আমরা যে কীর্তন করি তাও ভোলেন নি। মা চান যে আমি কীর্তন করি। 'স্নান করে কীর্তনে বস গিয়ে' আমার প্রতি মা'র শেষ নির্দেশ।)

এই দুর্যোগের মধ্যে এল ২২শে আগষ্ট—একাদশীর সুপ্রভাত তরুণ রবির অরুণ কিরণ মাথায় নিয়ে, মঙ্গলঘট স্থাপনের দিন—মন্দির প্রাঙ্গণে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতায় ভরে গেল। আনন্দ কোলাহল উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। মন্দিরের মূল পূজা সমাপনান্তে যথারীতি বাল্যভোগ করার পর মন্দিরের বারান্দায় শ্রীশ্রীমা আসীন হইলেন। সুবোধদাদা চিত্রিত জলঘটের উপর মহাপূজার সহায়তায় স্বস্তিক অঙ্কিত করিলেন। মায়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া মন্দিরের

সদর ফটকে সমবেত জনমণ্ডলী একত্রিত হইয়া, দিদিদের ঐক্যবদ্ধ হুলুধ্বনি ও খোল করতালের গগনভেদী ঝমঝম শব্দের মধ্যে শুভ্র শুদ্ধ রেশমী বস্ত্র পরিহিত এক সন্ন্যাসী—অপর গৃহী, প্রশান্ত চিত্তে সদগুরুর শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া ইষ্টনামে ঘট স্থাপন করিয়া রাস্তার আবিলতাপূর্ণ স্থানে সাষ্টাঙ্গ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই মনে হইল যেন কৃষ্ণের পার্শ্বে অর্জুন—গৌরাঙ্গের পার্শ্বে নিত্যানন্দ। মরি, মরি, কি গুরুভক্তির প্রকাশ। 'জয় গোঁসাইজী, জয় গুরুজী মহারাজ' ধ্বনিতে মন্দিরাঙ্গণে ও পার্শ্ববর্তী স্থানের আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হইল। আমা হেন পাথর জনের শুষ্ক হৃদয়ও বিগলিত হইল। কেবল হৈ হৈ !! রৈ রৈ !! দীয়তাং ভোজ্যতাম রব। ভাণ্ডারের ভার নিলেন নবনির্বাচিত ট্রাষ্টী—প্যারীমোহনদাদা স্বয়ং। সহায়ক হইলেন অচ্যুতদাদা, শান্তিপুরের ছোট বিজয়দাদা, ইঞ্জিনীয়র তারকদাস দাদা।

চণ্ডীপাঠ ও হোম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল। সকলে শান্তিজল ও যজ্ঞটীকা গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইলেন। বৈকালে যথারীতি শ্রীশ্রীরামনাম কীর্তন সুরু হল। সুবোধদাদা বসে সুরু করে দিলেন। বিনা অনুরোধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কীর্তন পরিচালনার ভার নিলেন আমাদের গৌরবের পাত্র বাণীর বরপুত্র কৃতী ও দক্ষকর্ম্মী শ্রদ্ধেয় 'নন্তু' (দার্জ্জিলিং-এর সাব-ডিভিশনাল অফিসার [ম্যাজিষ্ট্রেট] বিমলেন্দু সেনগুপ্ত) ও কাঁলাচাদ (রেলের অ্যাকাউন্টস অফিসার নরেশ সেন) সহকারী হইলেন ইহাদের অক্লান্ত কর্ম্মী ও ভক্তপ্রাণ চার ভাই—বিশু, প্রফেসর শিশির সেন, শ্যামল ও খোকা। উপযুক্ত সময়ে গানসহ আরতির পরে প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিত্যপাঠ্য সান্ধ্যস্তোত্র "শ্রীশ্রীমধূদ্বাশকম্" পাঠ আরম্ভ হইল। বিপুল জনতায় ভ্রাতা ও ভগিনীদের সমবেত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ—হোমান্তে বেদের মন্ত্রোচারণের ন্যায় উচ্চসুললিত এক

কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতে লাগিল। চতুর্দিকে কেবল মধুরং মধুরং ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। ভক্ত সমাগম ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। পুত্র শ্রীমান সন্তোষ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বধূমাতা উষারানীকে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ আদেশ পালনার্থে রাত্রিতে আসিয়া পৌঁছিল এবং পূর্বাপর নির্দিষ্ট কাজে প্রবৃত্ত হইল। সান্ধ্য কীর্তনের পর ভোগান্তে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মঠে কেবল আনন্দোচ্ছ্বাস, সকল সাংসারিক দুঃখকষ্ট, অভাব-অভিযোগ, আবিলতা-মলিনতা, বিবাদ ও বিসংবাদ শ্রীশ্রীদয়াল গোঁসাই সুনিপুণ হস্তে ধুইয়া মুছিয়া অপূর্ব শান্তিপূর্ণ ভাবের সৃষ্টি করিয়া পবিত্র মধুর রসসিঞ্চনে মনোপ্রাণ পুলকে ভরিয়া দিলেন। ধন্য ধন্য সদগুরুর কৃপা। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এক ভ্রাতৃসূত্রে গ্রথিত হইয়া ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে, উৎসবে যোগদান করিতে লাগিলেন।

২৩শে আগষ্ট দ্বাদশী—শ্রীশ্রীগীতাপাঠ অতিমধুর ও আকর্ষণীয় হইল। বৈকালে কৃষ্ণনাম—"যশোদানন্দন ব্রজবিহারী / গোবিন্দ-গোপাল কৃষ্ণমুরারি।" সুবোধদাদা যথানির্দিষ্ট সময়ে সুরু করিলেন। পরে ভূপতিদাদার সুললিত মধুর কণ্ঠে নামকীর্তন অপূর্বভাবে মূর্ত হইয়া উঠিল। ভাই নন্তু, নরেশ, বিশু, শিশিরের নিপুণ হস্তের খোলকরতাল বাজনায় সকলের প্রাণে আনন্দধারার সৃষ্টি করিল।

মহান্ত মহারাজের কার্যাবলীর প্রশংসা করিলে তাঁকে খাটো করা হইবে। যেন শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং আসনে বসিয়া প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত ও প্রেরণায় সকল কার্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইতেছেন। বাস্তবিক, এখনো তাঁহার প্রেরণাই সকলকে সজীব রাখিতেছে। ভোর হইতে রাত্রির প্রসাদ পাওয়া পর্যন্ত মহান্তজীকে দেখা গেল অবিরাম উপর নীচ ছোটাছুটি করিয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

প্রত্যেক ভোগের ব্যবস্থা ও সময়মত সকলকে প্রসাদ বিতরণের বন্দোবস্ত করিতে। ফাঁকে ফাঁকে উৎসব ফাণ্ডের জমার টাকা গ্রহণ করিতেছেন আবার আগত ভ্রাতা-ভগিনীদের বাসস্থানের সুশৃংখল বিলিব্যবস্থা, স্বামী গোবিন্দানন্দজীর সহায়তায়, করিয়া যাইতেছেন। এইদিন দলে দলে কলিকাতা, পাতিপুকুর, আসানসোল, ধানবাদ, গয়া, পাটনা, রামচন্দ্রপুর, দিল্লী, কানপুর ও অন্যান্য নানাস্থান হইতে বহু ভক্ত ও গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের আগমন হইল। অপ্রত্যাশিতভাবে আপ্রাণ কর্ম্মী ভ্রাতুষ্পুত্র দীনেশ ও বৌমা মিনু আসিয়াই নিজ নিজ কার্যে ব্যাপৃত হইল। ট্রাষ্টী অম্বুজ দাদা (গয়ার অম্বুজাক্ষ ঘোষ) আসিতেই সকলের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি সর্বদা সদুপদেশ দানে আমাদের কার্যে শৃঙ্খলা আনিয়া দিতে লাগিলেন। ধানবাদের ক্ষীতিশ-দাদার বাড়ীর দিদি এলেন, পাঁচপুত্র ও নাতি-নাতনী সহ, দাদার পুত্রেরা—প্রত্যেকে একাধারে গায়ক, বাদক, পরিবেশনকারী—তুলনা নেই। ইহারা স্থান পেলেন ভিন্ন বাড়ীতে শুধু রাত্রিতে শোবার জন্য। এরা পাঁচভাই এবং নন্তু কালাচাঁদেরা ছয় ভাই (বিশেষ উল্লেখযোগ্য সবাই উচ্চপদস্থ সরকারী দক্ষ কর্মচারী) সকল কার্যে সহায়তা, কীর্তনে যোগদান ও পরিবেশন কার্য সম্পাদন করাতে এসব কার্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল না। ভাই লক্ষ্মী-কান্ত রায় (উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী) স্বভাব সুলভ সরলতায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সেবায় গা ঢালিয়া দিয়া পরম আনন্দ ভোগ ও বিতরণ করিতে লাগিলেন। মহান্তজী ও গোবিন্দানন্দজীর অগ্রিম সুবন্দোবস্তে কোন ভ্রাতা ভগিনীর থাকার বিন্দুমাত্র কষ্টও হয় নাই।

এবার প্রাণের অন্তর্নিহিত আনন্দ প্রকাশ করবো। সমাধিপীঠের পুষ্পসজ্জা সর্বজন স্বীকৃত অতীব মনোমুগ্ধকর। স্বামী যোগানন্দের

নিপুণ শিল্পী হস্তের অপূর্ব কলাকৌশলের পূর্ণ অভিব্যক্তি, শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত যোগানন্দ, ঠাকুরের দয়ায় অনুপ্রাণিত হইয়া কিভাবে যে 'প্রণব' পুষ্পাঙ্কিত করিয়া সমাধিকে মূর্ত করেছেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। জনমণ্ডলী সমাধিপীঠে প্রবেশ করিলে আসিবার কথা ভুলিয়া যান। সম্মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের সৌম্য-মুর্তি হাস্যমুখ। স্থির দৃষ্টিতে ঠাকুরের প্রাণে চাহিলে মনে হয় যেন মধুর বাণী কানে ঝঙ্কৃত হইতেছে— 'দ্যাখ দ্যাখ—যোগানন্দের ভাব দেখ, ধন্য ভাই যোগানন্দ। ধন্য তোমার সার্থক সজ্জা পরিকল্পনা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সময় হইতে যাহার যে কাজ নির্দিষ্ট আছে তিনিই তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সর্বোপরি মহান্তজী সর্বকার্যে সদুপদেশদানে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছেন। সন্তোষ, দীনেশ, দাদা শৈলেন রায়, নন্তু, কালাচাঁদ এরা সকলে জায়গা লাগান, পাতা ও জল দেওয়া, স্থান পরিষ্কার করা এবং পরবর্তী বৈঠকের বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। সুবোধদাদা পরিবেশনের শৃঙ্খলা বিধান এবং সপুত্র পরিবেশনে অংশগ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ভাইরা সদা প্রস্তুত—যাহার উপর যে আদেশ তখনই তাহা অম্লানবদনে সম্পাদিত হইল। জনতার আগমনও সমভাবে চলিতে থাকিল।

২৪শে আগষ্ট ত্রয়োদশী—বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও আনন্দের বিষয় এই যে কাস্তোড়ের পাঠকদাদা (শ্রীশ্রীচরণ পাঠক) হাতীদাদা, শিব-রাম দাদা এবং আরও কয়েকজন গুরুভাই একদল কীর্তনিয়া দোহার বাদক ও দুইখানা নূতন মৃদঙ্গসহ আসিয়া উৎসবে যোগদান করিলেন। এদিকে ধানবাদের ক্ষীতিশদাদা ও রামচন্দ্রপুর আশ্রমের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা স্বামী অসীমানন্দজী আসিলেন। সকল কার্য দ্বিগুণ উৎসাহে চলিল। মঠ অকৃত্রিম ও অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ হইল।

৯—১১টা, শ্রীশ্রীগৌরনাম। শ্রীশচীনন্দন নদীয়া ইন্দু / পতিত

পাবন করুণা সিন্ধু॥ স্বামী যোগানন্দ, নন্তু, নরেশ, ভূপতি, বিশু, শিশির এবং কান্তোড়ের দাদাদের একত্র সমাবেশে শ্রীশ্রীগৌরনাম কীর্তন যে কি অপূর্বভাবে সুসম্পন্ন হইল তাহা বর্ণনাতীত।

অতঃপর আরম্ভ হইল—সাধু ভাণ্ডারা। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সাধু মহাত্মাদের সমাগম হইতে লাগিল। স্থানাভাববশতঃ অসুবিধা একটু হইল বটে, কিন্তু কেহ তাহা গ্রাহ্যই করিলেন না, পরিবেশন সম্পূর্ণ হইতেই শতাধিক সাধু মহাত্মার কণ্ঠে যখন 'পার্বতীপতয়ে নমঃ' ধ্বনি উত্থিত হইল—মঠের স্থাবর জঙ্গম মধুর ধ্বনিতে বিভোর হইয়া অনুভব করিল—'সত্যই তো, দক্ষিণে শ্রীনাম ব্রহ্ম, বামে বসুপ্রসবিণী রাজরাজেশ্বরী পার্বতীসহ স্বয়ং বিরাট পুরুষ সদগুরু সদাশিব মহেশ্বর বিরাজমান' সকলেই তাঁর চরণোদ্দেশ্যে মস্তক নত করিয়া ধন্য হইলেন, ভোজনান্তে মহাত্মাগণ দক্ষিণা গ্রহণপূর্বক, মঠের কল্যাণ কামনা ও ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বিদায় নিলেন। মহান্তজী ও ট্রাষ্টীগণ সর্বত্র উপস্থিত থাকিয়া কার্য সুসম্পন্ন করাইলেন।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুরুগম্ভীর ভাব। সমাধিপীঠে প্রণতঃ হইয়া কাতরে প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর বৃষ্টি হইলে নিরুপায়'। শ্রীশ্রীঠাকুরের সৌম্যবদনে প্রোজ্জ্বল হাসির বিকাশ অনুভব করিয়া প্রাণে অসীম আনন্দ পাইলাম। আকাশ শীঘ্রই মেঘমুক্ত হইল। বৈকালে যথা-রীতি শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যান হইল। সন্ধ্যায় আরত্রিককালে উপস্থিত ভাইদের ও কীর্তনকারীদের অপূর্ব ভাবের সমাবেশ দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। আজ স্বামী অসীমানন্দের উপস্থিতি আনন্দবর্ধক হইল। রাত্রে পূর্বতন মধু অধিকারীর অধিবাস কীর্তন সকলেই মন দিয়া শুনিলেন। ২৫শে আগষ্ট, চতুর্দশী—শ্রী শ্রীঠাকুরের জন্মতিথি। ভোর আরতির প্রাত্যহিক কীর্তনান্তে, 'ভজ গুরু গৌরাঙ্গ রাধা গোবিন্দ / ব্রহ্মনারায়ণ হরেকৃষ্ণ রাম' নাম কীর্তন আরম্ভ হইল। এমন গগন-ভেদী, মনোমুগ্ধকর নাম কীর্তন কখনও, কোথাও, এমন কি গত

৩৪ বৎসরের মধ্যে মঠেও শুনি নাই। মঠ ঝম ঝম করিতে লাগিল, যেন শত শত মৃদঙ্গসহ বহু কীর্তনের দল একত্রে কীর্তন করিতেছেন। মন্দিরের মূলপূজার পর শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশদাদা সমাধিপীঠে শ্রীশ্রীগুরু পূজা করিলেন। অতঃপর ভ্রাতাভগিনীগণ দলে দলে একত্রিত হইয়া সচন্দন পত্রপুষ্পাঞ্জলী পরমারাধ্যা গুরুদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। সমাধিপীঠে অঞ্জলি প্রদানের পর সকলেই শ্রীশ্রীমায়ের চরণে মাল্য প্রদানান্তে তাঁহার শুভাশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলেন। এমন সমাবেশ, এমন প্রাণমাতান ভাব, এমন বিপুল আনন্দ পূর্বে আর দেখি নাই। ভোগান্তের পর সকলেই অতি পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ পাইলেন। কেহ অভুক্ত রহিলেন না। মহান্তজী, সুবোধ-দাদা, অম্বুজদাদা, প্যারীদাদা ও পরিবেশনকারীরা সর্বশেষ প্রসাদ পাইলেন। আমি রোগী—আমাকে কিন্তু জোর ক'রে পূর্বেই প্রসাদ খাইয়ে দিলেন। অদ্যকার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ভোগরাগ ও কীর্তনের সময়, শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্য নির্দিষ্ট আসনে, বিশেষ চিহ্নাদি দর্শন করিয়া সকলেই অতীব তৃপ্ত হইলেন এবং বুঝিলেন যে প্রভু স্বয়ং বিরাজমান হইয়া আমাদিগকে শক্তি সঞ্চারিত করিতেছেন, সকলের সকল গ্লানি ধুইয়া পূত আনন্দ-ধারা সৃষ্টি করিতেছেন। অক্লান্তভাবে কীর্তনিয়াগণ সারাদিন নাম ধারা রক্ষা করিলেন। সন্ধ্যায় সমাধিপীঠে অপূর্ব আরতি দর্শন করিলাম। পূর্ণিমার সূর্যোদয় পর্যন্ত, পূর্ণ অষ্ট প্রহর, অখণ্ড নাম প্রচণ্ড নাদে অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিল। (রাত দশটা এগারটা। শান্তিদা মাকে প্রণাম করতে গেছেন। মা বললেন শান্তি বোস, আমার সঙ্গে নাম কর। বড় সুন্দর কীর্তন হচ্ছে। মা'র সাথে শান্তিদা ভজ গুরুগৌরাঙ্গ নাম করছেন। ক্রমশ মা'র কণ্ঠস্বর গম্ভীর নাদে নাম করিতে সুরু করল। আর সেই বার্ধক্যের কণ্ঠস্বর নয়—এমন ধ্বনি শান্তি আর শোনে নাই।)

২৬শে আগষ্ট পূর্ণিমা, শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর জন্মতিথি। বাল্য-ভোগের পর প্রসাদ গ্রহণান্তে বেলা ১০টার সময় সকলে লীলা কীর্তন শুনিতে বসিলাম। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীযুক্ত মধু অধিকারী গোষ্ঠ লীলা কীর্তন করিয়া বাস্তবিকই মধু বর্ষণ করিলেন। কীর্তনসহ ভোগ আরতি—এক অতি অপূর্ব দর্শনীয় ও উপভোগ্য ব্যাপার। পরে প্রসাদ বিতরণের কাজ সুরু হইল। যে যেখানে পারেন বসিয়া প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। একদল উঠিতেছে তন্মুহূর্তে জায়গা পরিষ্কার হইতে না হইতেই অন্যদল বসিয়া পড়িতেছে। স্থানাভাববশতঃ বিলম্ব হইতে দেখিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কাহারও মুখে বিষাদ বা কষ্টের চিহ্নমাত্র নাই। চারিদিকে কেবল 'আসুন—বসুন আর মাঝে মাঝে, 'গোঁসাইজীর কি জয়', 'গুরুজী মহারাজ কি জয়' ধ্বনিতে মঠ যেন কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মহা-মহোৎসবে আহূত অনাহূত রবাহূত কেহ বাদ গেল না। সকলেই প্রসাদ পাইলেন। কর্মীরা, আমরা কয়েকজন এবং মহান্তজী সর্বশেষে প্রসাদ পাইলাম। এবার বহিরাগত ভাইবোনদের সংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৪৫০ জন, কাশীবাসী এবং মঠস্থ ভাইভগিনী শতাধিক, এত বড় সমাবেশ পূর্বে কখনো হয় নাই। সকলেই আনন্দে বিভোর হলেন। সকলের মুখেই এক কথা—জীবনে এমন আনন্দ আর কখনো পাই নাই।

অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে এবার দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই দুইদিনে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী অনেক প্রার্থীদের অকাতরে অপার্থিব নাম দানে কৃতার্থ করিয়াছেন। দীক্ষিতকের মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব ভাব সমাবেশ পরিলক্ষিত হইল। সদগুরুরূপী ভগবতী শ্রীশ্রীমা এবার অকাতরে নাম দান করিয়াছেন। কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। আমাদের গুরুভাই কোতরং নিবাসী শ্রীযুত ভূপাল পালচৌধুরীর চারি বৎসরের কন্যা নাম পাওয়া মাত্র 'কর' ধরে

সাধন করতে বসলেন। মা দেখালেন—সকলে ভাখ গোঁসাইজীর কি কৃপা। যেমন ঢাকায় ধূলটের সময় গোঁসাই প্রভু কল্পতরু হয়েছিলেন এবার তেমনি শ্রীশ্রীমাও সদগুরুরূপে নাম বিতরণ করিয়া বহুজনকে কৃতার্থ করিলেন। (আমার মেজবৌদি শ্রীমতী অরুণা দেবী ও আমার স্ত্রী শ্রীমতী চামেলী দেবীর সাধনও এই বৈঠকে হয়—শি. সে) ২৭শে আগষ্ট রবিবার, বার্ষিক সভা। বাল্যভোগের প্রসাদ গ্রহণান্তে তিনতলার ছাদের উপর বার্ষিক সভার আয়োজন হইল। অসুস্থ শরীর লইয়াই শ্রীমা সানন্দে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অনুমতি লইয়া সভার কার্য আরম্ভ হইল। মহান্তজী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব ও কার্যবিবরণী পাঠ করিয়া শুনাইলেন। অতঃপর মঠের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার উন্নতিকল্পে কতকগুলি প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা ও যুক্তি তর্ক সুরু হইল। স্থায়ী ভাণ্ডারের টাকা লগ্নী করা ও সাধারণ কার্য পরিচালনার ব্যাপারে ভাই কালাচাঁদ (নরেশ), নন্তু (বিমলেন্দু), স্বামী অসীমানন্দ, প্রমোদদাদা, অচ্যুতদাদা, ডাঃ প্রভাত ভৌমিক ও দীনেশ প্রভৃতি এমন যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব সকল উত্থাপন করিলেন, যাহা মঠের পক্ষে বাস্তবিকই কল্যাণকর ও আয়বৃদ্ধিজনক। ট্রাষ্টীবর্গ বিনা আপত্তিতে আনন্দের সহিত ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ভাই নরেশ ও বিমলেন্দুর তর্ক অতি সুযুক্তিপূর্ণ ছিল। সভায় বহু বিষয় মীমাংসিত হইল। সভার এমন সমাবেশ ও সুসম্পাদনা কোন বছর দেখি নাই।

মধ্যাহ্নে ভোগরাগের পর কাঙালী ভোজন বড়ই মনোরম ভাবে সম্পন্ন হইল। চারিশতেরও অধিক কাঙালী পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিল। একটি প্রার্থীও অভুক্ত ফিরিয়া যায় নাই। সান্ধ্য আরতির পর কাস্তোরের পাঠকদাদার আনীত

কীর্তনিয়াদের লীলা কীর্তন অতি মধুর হইয়াছিল। ২৮শে আগষ্ট, সোমবার—শেষ দিবস। উৎসবের পরিসমাপ্তি। বৈকাল ৪টায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সভাধিবেশন ও বিদায় পর্ব শেষ হইল। উপস্থিত ভ্রাতাগণ প্রায় সকলেই, ভগিনীগণের মধ্যেও কেহ কেহ ও বহু বালকবৃন্দ সমভিব্যহারে স্বয়ং মহান্তজী অগ্রগামী হইয়া নগর কীর্তনে বাহির হইলেন। শোভাযাত্রা প্রায় এক ফার্লং দীর্ঘ। মৃদঙ্গ করতালে গভীর রব যেন মূর্ত হইয়া কেবল ভজ গুরু গৌরাঙ্গ রাধা গোবিন্দ ধ্বনি জনতার কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। রাস্তার পদচারী ও যানবাহন আরোহী সকলেই মুগ্ধ হইয়া কীর্তন শোভযাত্রার রূপ দর্শন করিতে লাগিল। একঘণ্টা নগর পরিক্রমার পর ফিরিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবর্তিত প্রথা অনুযায়ী জলকেলীর গান ধরিল—

ওরে প্রেমের গাঙে রং বেরঙের জোয়ার এসেছে।
ছিল যত কিছু উঁচু নীচু সকল ভেসেছে॥
জলের পরশ পেয়ে ডাঙায়-ভুঁয়ে ভাঙন এসেছে।
পেয়ে মাটি খাসা, রসিক চাষা, ফসল চষেছে॥
নদীর কুলে কুলে বিনা মূলে দোকান বসেছে।
ওরে গ্রামে গ্রামে মধুর নামের ধ্বনি পশেছে॥
এবার কেনা বেচা কেবল লাচা নিতাই বলেছে
যত পুরুষ নারী ভরম ছাড়ি নাইতে চলেছে॥
পেয়ে ঢেউয়ের দোলা পুটলী ঝোলার বাঁধন ফেসেছে।
ঐ দেখ গাঙের জলে আলোর ছলে কিরণ হেসেছে॥

অতি প্রেমে গদগদ কণ্ঠে নৃত্যসহকারে গান শেষ করিয়া জলকেলী শুরু হইল। ইহাতে ডাঃ প্রভাত ভায়া উদ্যোগী হইয়া সকলকে টানিয়া নিয়া মহোল্লাসে জলকেলী করিলেন। অন্যান্য বৎসর ভাই মঙ্গলচাঁদ জলকেলীতে অগ্রণী হইয়া বিমল আনন্দ দিতেন—এবার

রোগের তাড়নায় শয্যাশায়ী আছেন। প্রতিক্ষণে তাঁহার অভাব অনুভব করছি। প্রভাত ভায়া এ বছর সে স্থান পূর্ণ করিলেন। শ্রীঅঙ্গণে জলের ঢেউ খেলিল।—লুটাপুটি আরম্ভ হইল, জীর্ণ ও ভগ্নস্বাস্থ্য বলিয়া আমিও রেহাই পাই নাই। উপরের দোতলা হইতে দিদিদের হলুদগোলা জল ও পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ভাষায় বর্ণানাতীত, কেবল অন্তরে উপভোগ্য। এইখানেই উৎসবের সমাপ্তি হইল। আমি, না লেখক না ভাবুক—কিন্তু যাহা বর্ণনা করিলাম বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়।"

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের অতি প্রাচীন সদস্য এবং দরবেশজী মহারাজের নির্বাচিত ট্রাষ্টী রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র ঘোষ নিজেই একটি ইন্সষ্টিটিউশন, ১৯৬১ সালের উৎসবে তাঁর বয়সও আশি ছুঁই ছুঁই করছিল। কিন্তু কী স্নেহ ভালবাসা এবং রসিক মন নিয়েই না তিনি আমাদের সাথে মিশতেন। তিনি ফুলের মতো ছিলেন। হি ওয়াজ লাইক এ ফ্লাওয়ার গিভিং ফ্রাগ্রান্স টু এভ্‌রিবডি।

তিনতলায়। যোগেশদার রচনা উৎসবের পোষাকি, অফিসিয়াল ভারসন্। এ ছাড়া উৎসবের আর একটা রূপ আছে। ধর্ম বস্তুটি রাশভারী কিছু নয়। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি সব ধর্মার্থীদেরও আছে। আছে রসিকতা, মন খারাপ হওয়া, ব্যক্তিত্বের সংঘাত। ব্যক্তিগত সংস্কার (ইডিওসিন্‌ক্রেসী) বয়সের পার্থক্য, পরিবর্তিত যুগধর্ম এবং অভ্যাসের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ছেলেবুড়ো সবাই যেন এক সখ্যতায় বাধা। তিনতলার ঘরে আসন করেছেন টাটানগরের মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝরিয়ার কবিরাজ রাসবিহারী সেনগুপ্ত, যাদবপুরের অমূল্য ঘোষ, কাশীশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অপরেশদা, ধানবাদের সুনীল সাউ, নরেশ দাস, সুধীর বসু, বিশ্বনাথ সেনশর্মা। আর আছি আমরা চার ভাই। শ্যামল বোধ হয় সকলেরই ছোট ঐ ঘরে, বয়স ১৬-১৭। অমূল্যদা, কাশীদা, কবিরাজদা খাটের ওপর।

মণিদা সরল বিশ্বাসী, স্নেহশীল কিন্তু চট করে রেগে যান এবং তার উৎসব সুরুই হোল সন্তোষদার সাথে ঝগড়া দিয়ে।

হু ইজ হি টু অর্ডার মি। বাইশ বছর পরে মণিদা মঠে এসেছেন, কিন্তু বাইশ ঘণ্টার মধ্যে মণিদাকে সবাই চিনলো। ঝুলিতে সিগারেটের টিন্—পরিবেশনের ফাঁকে ধূমপান করছেন—করাচ্ছেন উপরে এসে। আর গল্প, কি করে কলকাতায় ঠাকুর এলেই তিনি বুঝতে পারতেন কেউ তাকে খবর দিতেন না। তিনি তামাকের গন্ধ পেতেন এবং ঠাকুরের কলকাতার বাসস্থানে উপস্থিত হতেন, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করতেন—তুই খবর পাস কি করে? মণিদার গল্প, সিগারেট ও চরিত্রের জন্য আমি, রাঙাদা ও নরেশদা ওঁর সাক্‌রেদ হয়ে উঠলাম রাতারাতি। মণিদা এক জীবন্ত বিশ্বাস। বুঝলে নরেশ, ডোণ্ট শো মি মানি। টাকা দেখিও না। আমার কাছে টাকা উড়ে আসে, টাটানগর তখন আজকের টাটা নয়—সবে টেলকোর কারখানা বসেছে। সেই থেকে আমি টাটায়, সাধারণ অবস্থা থেকে আজ এই অবস্থায় এসেছি। পারচেজএ আছি, ইচ্ছে হলে লোকে বাড়ি বয়ে টাকা পয়সা আসবাব, তোমাদের দিদির গহনা দিয়ে যায়। ঠাকুরের আশীর্বাদে হাত নোংরা করতে হয়নি জীবনে, প্রথম জীবনে অর্থকষ্টও পেয়েছি—কিন্তু ভেঙ্গে পড়িনি, ঠাকুরই রক্ষা করেছেন।

টাটানগরে ভীষণ গরম, সেবার বৈশাখমাসের শেষ, আর কিছুদিন পরেই পুরীতে গোঁসাইজী স্মরণোৎসব। প্রতিবার উৎসব সুরু হবার আগেই আমার দু'টো টাকা পৌঁছে যায় পুরীতে, টাকা পাঠাতে হবে হাতে একটা পয়সা নাই। সেদিনই না পাঠালে উৎসবের আগে টাকা পৌঁছবে না। ভীষণ দুশ্চিন্তা, দুপুরে খেতে এসেছি—একই চিন্তা কোথায় টাকা পাই। ধার করে দেওয়া যায়, কার কাছেই বা টাকা চাইব, খেয়ে দেয়ে অফিসে চললাম। কাঠফাটা রোদ, হঠাৎ দেখি গরম হাওয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে, সঙ্গে

ঝরা পাতা, আর ধুলো, জামাকাপড় বাঁচাতে আমি পেছনে ছুটছি, হাওয়ার কুণ্ডলীও পেছন পেছন। আর কত ছুটবো, পাশের একটা বাড়ীর বারান্দায় উঠলাম দৌড়ে—হাওয়ার কুণ্ডলীটাও, আমি ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে গেলাম, হঠাৎ দেখি আবর্জনার মধ্যে রঙিন একটি কাগজ ওপরে উঠছে আর নীচে নামছে, দু'তিনবার দেখে পা দিয়ে চেপে ধরলাম কাগজটাকে, সঙ্গে ঝড়ও আমাকে ছেড়ে উধাও হোল, পায়ের নীচ থেকে কাগজটা তুলে দেখি একখানা করকরে দু'টাকার নোট। এই তো টাকা! এই তো টাকা! এর জন্যই তো দু'দিন ধরে ভেবে মরছি, নির্জন গ্রীষ্মের দুপুর, আশেপাশে কেউ নেই যে, জিজ্ঞেস করবো তার টাকা কি না, ছুটে গেলাম পোষ্ট অফিসে, জানাশোনা পোষ্টমাষ্টার; মনি অর্ডার নেওয়ার সময় পেরিয়ে গেলেও আমার টাকা নিলেন। ভাবলাম ধন্য গোঁসাই, তোমার উৎসবের টাকা তুমি নিজেই জোগাড় করে দিলে—যোগক্ষেম বহাম্যহম্।

মাঝে মাঝে দীক্ষার গল্প উঠত, কি করে দীক্ষা হল। মণিদার ছোটবেলা থেকে ধর্মভাব। দীক্ষার ব্যাপারে বাবা খুব নারাজ। নিজে গুরুর পিছনে অনেক টাকা ঢেলে নিঃস্ব হয়েছেন। ব্রাহ্মণের ছেলে পৈতে হয়েছে, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ কর, সৎভাবে থাক, আর কিছু করতে হবে না। মণিদাও ব্রহ্মচারীর মত থাকেন। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর মা আর মণিদার ঠাকুমা ছিলেন সহোদরা। গোঁসাইজীর সাধন সম্বন্ধে মণিদার বাবার কিছু শ্রদ্ধা আছে। গোঁসাই-শিষ্য 'বেহালাবাদক' সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণ নিলেন মণিদা। তিনি দরবেশজীর কথা বললেন। একদিন এসে জানিয়েও গেলেন, দরবেশ কলকাতায় এসেছেন। এবার বাবা মত দিলেন। গোঁসাইজীর সাধন—সে আলাদা ব্যাপার।

যোগেশ্বর দাদার বাড়ী যশোহর খুলনায়। ছোটখাট জমিদার। ছোটবেলায় এক সাধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বাড়ী এসে

বাবাজীদের বেশে থাকেন। কাকা খুব ধর্মপ্রাণ। দীক্ষা নেবার ঝোক হয়েছে সেবার। এক সাধুকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখেন। সেই উদ্দেশ্যে তীর্থে তীর্থে ঘুরবেন। যদি স্বপ্নে দেখা সাধুর দেখা পান। ভাইপোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তীর্থে। অনেক জায়গা ঘুরে গয়ায় উপস্থিত হলেন। গয়ার আকাশ গঙ্গা পাহাড়—সাধুদের আড্ডা প্রাচীন কাল থেকে। আকাশ গঙ্গায় এলেন কাকা-ভাইপো।

আকাশ গঙ্গায় সাধু পেলেন—কিন্তু স্বপ্নের সাধু কোথায়? এক সাধু বললেন, আপনারা কাশীতে যান সেখানে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ-মঠের দরবেশজীকে দর্শন করে আসুন গিয়ে।

কাশী অবশ্যই তাদের ভ্রমণ তালিকায় ছিল। কাশীতে এসে বিশ্বনাথ দর্শন করলেন। প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে ঘোরেন। হঠাৎ একদিন স্বপ্নে সাধুকে দেখতে পেলেন। সাধুর পেছন পেছন ছুটতে সুরু করে দিলেন। কিন্তু সাধুকে ধরে কার সাধ্য—সাধু যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছেন। প্রাণপণ ছোটা সত্ত্বেও সাধু মিলিয়ে গেলেন। হতাশ হয়ে সেই রাস্তার ধারে আরো কিছুদূর এগোলেন। পথের শেষে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ। এই মঠের কথাই তো গয়াতে শুনেছেন।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে দরবেশজীর সাথে দেখা হল। দরবেশজী কাকার স্বপ্নের সাধু। কাকা সাধন প্রার্থী হলেন। কিছুদিন বাদে দীক্ষার দিন ধার্য হল।

প্রতিদিন মঠে যান। বৈঠকখানায় পূজো শেষে দরবেশজী এসে বসেন। কত লোক আসে, প্রসঙ্গ ওঠে কত। বাবাজীও প্রণাম করে বসে থাকেন। বাবাজী কি চান? কিছু বক্তব্য আছে নাকি? না শুধু দেখতে আসি, কাকার সাথে আসি। মনে মনে ভাবেন শুনেছি সদ্‌গুরু সময় হলে ডেকে সাধন দেন। ইনি যদি

সদ্‌গুরু হন এবং আমার যদি সদ্‌গুরু সাধন ভাগ্য থাকে, ডেকে সাধন দেবেন।

দীক্ষার দিন। গঙ্গাস্নান সেরে কাকা মঠে চলে গেলেন। যোগেশ্বরদাদা দরজা বন্ধ করে কাঁদছেন। কাকার গুরু জুটে গেল, আমার কপাল মন্দ। হঠাৎ দরজায় আঘাত হল। ভিতরে কে আছেন দরজা খুলুন। দরবেশজী সাধন বৈঠক থেকে লোক পাঠিয়েছেন, বাবাজীকে ডেকে আনো—সাধন হবে।

নিরাশার নিশোয়াসে হতাশ যে জন
করিলে তাহার প্রাণে আশার সঞ্চার,
অযাচকে যেচে দিলে রাতুল চরণ,
প্রহরীর সাজে তুমি প্রভু হে আমার।

ভুজঙ্গদা তখন স্কুলের ছাত্র—ক্লাস সেভেন-টেভেন হবে। এক সহপাঠী স্কুল ছুটী হলে বললে—ভুজঙ্গ আমাদের বাড়ীতে এস, মস্ত সাধু এসেছেন, ইয়া শরীর। কাশীতে থাকেন। কাল আমার দীক্ষা হবে। দীক্ষা কি রে, কী হয় দীক্ষা নিলে? ভগবানের নাম রে বোকা। আর কোন দুঃখ থাকে না, ভয় থাকে না। ভগবান তখন সবটাতেই হেল্‌প করেন। ছুটল ভুজঙ্গ সাধুর কাছে। আমাকেও সাধন দিতে হবে আপনার। তা কি করে হবে বাবা। কেন হবে না, ওর চাইতে আমি কম কিসে, খারাপ কিসে। আপনি ইংরেজী, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস যে কোন বিষয়ের নম্বর দেখুন। আমার নম্বর কিছুতেই কম নয়। হো হো করে হেসে উঠলেন দরবেশজী, কাল যে নির্দিষ্ট লোকেরাই সাধন পাবে। তোমারও হবে। পরে, বেশ কিছুদিন পরেই সাধন হল ভুজঙ্গের।

সময় হলে হবে। অসময়ে কিছুই হয় না। "সময় না হইলে কিছুই চেষ্টায় লাভ হইবে না। ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা কর এবং ভগবানকে ডাক। তিনি যথাসময়ে সদ্‌গুরু দেখাইয়া দেবেন।

নহিলে সমস্তই বিফল। বীর হও, মানুষ হও, জাগ্রত হও। ভগবান, মানুষকে আশ্রয় দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।"

তিনতলার ঘরে অমৃতানন্দজী এসেছেন ধূমপান করতে। দীক্ষা গল্পে মজে গেলেন তিনিও। ব্রাদার, গোঁসাইজীর সাধন কিছু বস্তু। আমাকেই দেখ না, কতদূর আর পড়াশুনা করেছি—লীলাকীর্তন করি ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করি সব কিছুই ওঁর কৃপায়। ছোটবেলা বাবার সাথে কীর্তন করি, এখানে সেখানে যাই। বরিশালের বাসণ্ডায় সেবার নীলকণ্ঠ শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এসেছেন। গ্রামের জমিদার শিববাবু গোঁসাইজীর শিষ্য। তাঁর এক চিঠি নিয়ে যেতে বাপ-পো'র সাধন হল।

বরিশালের কেওড়া-বেলতাখানে গোঁসাইজীর শিষ্য ছিল বেশ কয়েকজন। কেওড়ার শিব সেন (অবিনাশচন্দ্র সেন), রণমতির পতাকী পণ্ডিত মশাই, তার ছোট ভাই ছোট ঠাকুর, যোগেশ ডাক্তার ও তার ভাই এরা মিলে এক সুন্দর যোগাশ্রম বানিয়েছিলেন। পতাকী পণ্ডিত আর দুর্গামোহন পণ্ডিত মশাই মাসতুতো ভাই। দুজনেই পরে সাধন দেন।

পতাকী পণ্ডিত মশাইয়ের সাধন বিষয়ে আমাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকে বলেন, গোঁসাইজী এ ব্যাপার জানতে পেরে তাঁকে ত্যাগ করেন। গুজব। প্রথমতঃ সদ্‌গুরু কখনোই শিষ্যকে ত্যাগ করেন না। দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিত মশাই গোঁসাই দেহে থাকতে সাধনও দেন নাই। পতাকী পণ্ডিত আর নিত্যগোপাল গোস্বামীর মধ্যে লোকে গোলমাল করেন—নিত্যগোপাল গোস্বামী সম্বন্ধে দরবেশজী লিখেছেন—

"গোঁসাই শেষবার যখন ঢাকায় ধূলট করেন, তখন শ্রীনিত্য-গোপাল গোস্বামীকে এই সাধন দিবার অনুমতি করিয়াছিলেন। নিত্যগোপাল গোস্বামী প্রসিদ্ধ 'রাই উন্মাদিনী' ইত্যাদি গীতিকাব্যের

প্রণেতা কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পুত্র ও আমাদের গুরুভ্রাতা। গোঁসাই জীবিত থাকিতেই, নিত্যগোপাল সকলকে সাধন দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ইহার ব্যবহার সদাচার বিরুদ্ধ ও গর্বিত হওয়ায়, এই ক্ষমতা আবার কাড়িয়া লইয়াছিলেন।”

অষ্টপ্রহর উৎসবে অমৃতানন্দজীর ভাটিয়ালী সুরে ‘ভজ গুরু গৌরাঙ্গ’ নাম গান সেবার অনেক নিদ্রাবিলাসীকেও ঘুম হতে তুলে কীর্তন আসরে এনেছিল।

মঠে বিছানা-চা চলবে না। ভোরবেলায় চা রসিকদের তাই দোকান ছাড়া গতি নাই। অম্বুজদা, কালাচাঁদ দা, আর আমি প্রতিদিন পণ্ডিতের দোকানে ভাঁড়ে করে চা খেয়ে আসতাম। বে-টাইমে চা-র প্রয়োজনেও পণ্ডিতের দোকানে ছুটতে হত। চায়ের দোকানে গুরুভ্রাতা বিশ্বনাথ সেনের একদিন দরবেশজীর জন্য সে কি কান্না!

কান্না তিনতলায়ও। শাস্ত্রীদা (মৌলিনাথ শাস্ত্রী) এসেছেন। কথায় কথায় দরবেশজীর জবানীর ব্যাপার উঠল। জীবনী থেকে চিঠি। দাদা তখন থেকেই দরবেশজীর চিঠি সংগ্রহ করেন। এতো চিঠি। আর বিষয়বস্তু ও কত বিভিন্ন, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল বিষয়েই দরবেশজী লিখেছেন।

শাস্ত্র সদাচার থেকে সুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য, আহার বিহার, মায় কামসূত্র পর্যন্ত। কাশীতে করেসপণ্ডেন্স কোর্সের এক ইউনিভারসিটি খুলেছিলেন যেন। ‘যদি নরকে যাও, জানিবে সেখানেও বুকে রাখিবার একজন আছে,’ ‘তোমরা কেহ-ই মাঠে মারা যাইবে না। আমার সারাজীবনের তপস্যা আমার শিষ্যদের সকল অপরাধের ‘সিকিউরিটি’ ইত্যাদি বাক্যে কান্নার রোল পড়ে যেত। শিষ্য লিখেছে মৃত্যুকালে গুরুদর্শন হয়—একথা কি ঠিক। ‘মৃত্যুকালে গুরুদর্শন অবশ্যই হবে ‘তাই বলিয়া গুরু যমরাজের দূত নহেন’ গুরুকে

দেখতে চাও—সাধন কর। নিত্য নিয়মমত সাধন। তবে তপস্যা দ্বারা সামর্থ অর্জন না করলে গুরু দেহ রাখলে সাক্ষাৎ দর্শন হয় না। একমাত্র নামই সকল মুশকিল আসান। নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

আড্ডার ফাঁকে কীর্তন, ভোগারতি, প্রসাদ-পাওয়া। আবার আড্ডা। আড্ডা মানে কীর্তন, পুরুষোত্তম ধামে হাঁটলে পরিক্রমার কাজ হয়, ঘুমালে সমাধির। মঠের আড্ডায় কীর্তনের কাজ হয়। মঙ্গলদার শালগ্রামের গল্প তো প্রায় পণ্ডি। প্রভাতদা বলতেন দেখুন, তিনতলা প্রেমভক্তির স্থান। আমাদের কথাবার্তায় ভুলেও যদি আপনার আমাদের উপর খারাপ ধারণা হয় তবে আপনারই অপরাধ হবে। তিনতলা বাসের সামর্থ্য অর্জন করতে হয়।

সবাই মাকে মালা পরাতে যাচ্ছে। আমিও। মনে ভয় মা যদি বকেন। না যদি পরেন আমার দেওয়া মালা। আমি যে বিধি-নিষেধ মানি নে ঠিকমত। সাধনও তো করি না নিত্য নিয়মিত। ভয়ে ভয়ে নাম করতে করতে মালা হাতে মা'র কাছে গেলাম। চিরদিন দেখেছি হাজার ভিড়ের মধ্যে নাম করতে থাকলে মা তাকাবেনই। এবারও অন্যথা হল না। মাকে গলায় মালা পরিয়ে প্রণাম করলাম। মা'ও গলা থেকে একখানা বেশ বড়, দামী ও সুন্দর মালা আমাকে পরিয়ে দিলেন। মণিদাকেও। তিনতলায় এসে এই নিয়েই ঝগড়া বাধল। মণিদা বললেন—আরে তুমি বড় মালা দিয়েছ মাও বড় মালা দিয়েছেন, আমি তোমার মত পয়সা খরচা করে বড় মালা দেইনি। সাধারণ মালাই দিয়েছি, তবু দেখ মা আমাকে কেমন সুন্দর মালা দিয়েছেন।

মণিদার ইচ্ছা মার প্রসাদ পাবে। ভিড় আর গুরুভগিনীদের মনোপলির জন্য মার কাছ পৌঁছতেই মেজাজ খারাপ। মা'ও প্রসাদ দিতে আপত্তি করলেন। দিলেন অবশ্য শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় দিনেও ঐ অবস্থা। মনের দুঃখে এসে শুয়েছেন তিনতলায়। ঠাকুর থাকলে

কি আর এমন হত। ঠাকুর নেই, কে আর মণীন্দ্র বলে ডাকবে: তন্দ্রাবস্থায় দেখলেন, মা এসে দাঁড়িয়েছেন মাথার কাছে। 'তুমি বুঝি ওর কাছে সাধন নিয়েছ?'—মায়ের মিষ্টি কণ্ঠস্বর! চমকে উঠলেন মণীন্দ্রনাথ। সে কি আমি ঠাকুর আর মা'র মধ্যে পার্থক্য করেছি। ওরা যে এক। যতদিন ঠাকুর ছিলেন ঠাকুর আর মা'র কাছে ভিন্ন রস আস্বাদন করেছি। এখন যে মা'ই সব একের ভিতরে • দুই। মণিদা শ্রীমাকে প্রণাম করতে ছুটলেন। এবার মা কথা বললেন। মণিদার মা'কে থেকে বললেন—ছেলের কোঁচা মাটিতে গড়াচ্ছে—পড়ে যাবে যে।

এখানে তেজ নয়, বেদান্ত দর্শন নয়, সাধন গর্ব নয়—শুধুই ভালবাসা। বাচ্চা, খেলা কর্। কালাচাঁদ স্বপ্ন দেখল ঠাকুর বলছেন—ওরে তোর মার কাছেই চাবিকাঠি।

তব মনোময় মূর্তি করিয়া নির্মাণ
মন সাধে মন-মাঝে বসাব প্রতিমা
সাজাইব নানাবিধ গন্ধ উপাদান
আনন্দ-সিন্ধুর স্রোতে ধুইবে কালিমা।

এখন ধন্যবাদ এবং ঋণ স্বীকারের পালা। মাতৃ-পিতৃ ঋণের কথা বাদ দিলেও এ পৃথিবীর আকাশ বাতাস, ফুল পাতা, সূর্যালোক, মানুষের ধীশক্তি, কবিতা, গান মাতৃস্তন্যের মতোই আমাকে পুষ্টি জুগিয়েছে, জোগাচ্ছে। সময়মত এদেরই হয়ে গিয়ে, মাটিতে মিশে গিয়েই মাটির ঋণ, পৃথিবীর ঋণ শোধ করব। তার আগে প্রাণ ভরে অমৃত বাতাস আস্বাদন করি।

বাংলাদেশে আকাশে বাতাসে কবিতা, গান। ভালমন্দ বুঝি না, বাংলাভাষায় কবিতাই পড়া যায়। এই বইতে অনেক কবির কবিতা, গান ইচ্ছেমত ব্যবহার করেছি—জ্ঞান দেখাবার জন্য নয়, কবিতার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হিসাবেও নয়, অন্যথা পারিনি তাই। কবে যে ওরা নিজের হয়ে গেছে! নৌকোয়, রাস্তায়, রেলে বৈরাগী বাউলদের কাছে কত গান শুনেছি, লিখতে গিয়ে টের পেলাম ওরা, হারিয়ে যায়নি। মা'র রান্না করতে করতে পদাবলী কীর্তন, বাবার ঘর পরিষ্কার করতে করতে, বর্ষার আগাছা তুলতে তুলতে গাওয়া গান, তাঁর স্নেহের মতোই আমাকে ঘিরে আছে। এছাড়া কীর্তন তো আছেই। মনের মধ্যে যা রয়েছে, ভাবপ্রকাশের জন্য যাদের ছাড়া আমার গতি নেই, তাদের উৎস সন্ধানে জীবন কেটে যাবে, লেখা আর হবে না। বৈষ্ণবপদকর্তাদের থেকে স্বুরু করে বাংলার আধুনিকতম কবিকে আমার প্রীতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর 'সদগুরু সঙ্গ' গোঁসাই শিষ্য, পূজ্যপাদ দ্বারিকানাথ রায়ের 'সদগুরু লীলানুস্মৃতি', পরমারাধ্য শ্রীশ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ প্রতিষ্ঠিত 'মন্দির' পত্রিকা, শ্রীপাদ অমিয়কুমার সান্যাল কৃত

'শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত', গোঁসাইজীর 'বক্তৃতা ও উপদেশ', শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং দরবেশজী মহারাজের অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে এই স্মরণ-মননের অনেক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে।

আমার দাদা, ভক্তিভূষণ শ্রীবিমলেন্দু সেনগুপ্ত, তাঁর গ্রন্থাগার, আমাকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে দিয়েছেন। মাঝে মধ্যে তার আদরের ধন এবং বহু ধৈর্যের সংগ্রহ করা দরবেশজী মহারাজের সহস্রাধিক পত্রের ফাইলেও হাত দিতে দিয়েছেন। ছোট ভাই, তাই দিয়েছেন, আমার মত সাধনশক্তিহীন, কথায় বৃহস্পতি, ভাবপ্রবণ ব্যক্তির মতামত যে একান্তই নিজস্ব সে কথা বলাই বাহুল্য। ধর্মের ভানও ভাল।

দরবেশজীশতবার্ষিকী দর্শকের তিন বৎসর শেষ হয়ে গেল। জ্ঞানীগুণী এবং রসিক সাধকগণ সেই প্রেমিক, জনদরদী, কবি এবং সদগুরুর স্মৃতিচারণে অগ্রণী হোন এই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমা ও দরবেশজী মহারাজ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত